দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

মানহায আর্কাইভ-২০১৭

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

সূচীপত্র

জঙ্গিবাদের অভিযোগ থেকে কখন আপনি মুক্ত হবেন? ৪

উম্মাহর নেতৃত্বদানে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী ১৫

সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার ভয়াবহতা ৩৩

নব্য মুরজিয়া! ৪৬

আমার বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার প্রসঙ্গে মুফতি তাকি উসমানী দা:বা: এর দাবির পর্যালোচনা-৪ ..... ৫৪

আল্লাহর পথে ব্যয় করা ফরজ ৬১

একজন মুরজিয়া এবং ইরজায় আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য ! ৬৬

স্কুল অফ জিহাদ ৭১

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের প্রসঙ্গে মুফতি তাকি উসমানী দা:বা: এর দাবির পর্যালোচনা-৩ ..... ৭৫

স্বর্ণ দিনারের প্রত্যাবর্তন এবং জুলুমের অর্থনীতির পতন ৭৯

আল-কায়েদা দ্বীন কায়েমের মিশন, শুধু জিহাদি সংগঠন নয়! ৯৪

প্রিয় ভাইয়েরা একটু সাহায্যের প্রয়োজন। ৯৬

বিশ্বব্যাপী জিহাদি ফ্রন্টগুলোতে চলমান অস্থিরতাঃ ৯৯

কিছু মতামত ও কিছু প্রস্তাবনা! ৯৯

সারগর্ভ: একটি কৌশলগত পর্যালোচনা- ১০৪

জঙ্গিবাদের অভিযোগ থেকে কখন আপনি মুক্ত হবেন?

Ahmad Nabil·

ibn jiad

Member

০৩-৩১-২০১৭

তাগুতের হাতে গ্রেফতারের পূর্বে এক শহীদ আরব মুজাহিদের লেখা শেষ প্রবন্ধ অনুকরণে-
(মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারলে বোঝার আছে অনেক কিছু, চিন্তাশীল সকল ভাইকে সম্পূর্ণটা পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি)

এক
কেন আমি ওয়ান্টেড পার্সন?

চার দিক থেকে জবাব আসতে লাগলঃ সন্ত্রাস..... সন্ত্রাস ..... (জঙ্গিবাদ)।

তুমি সন্ত্রাসী (জঙ্গি)। আর সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সন্ত্রাসকে দমন করা, জঙ্গিবাদের নির্মূল করা।

ঠিক আছে .....।

সন্ত্রাসের এই অপরাধ থেকে আমি মুক্ত হতে চাই, যার ফলে আমি আজ মোস্ট ওয়ান্টেড, আমাকে বন্দি ও হত্যা করা সরকারের দায়িত্ব। বলুন, কি সেই সন্ত্রাসটি? উত্তরঃ মানুষ হত্যা .....।

কিন্তু ....., সৌদি সরকারও তো মানুষ হত্যা করে .....।

তারা শায়েখ ইউসুফ আল-ওয়াইরী, বীর মুজাহিদ দান্দানী সহ অন্যান্য আলেম ও মুজাহিদীনদেরকে হত্যা করেছে। তাহলে সৌদি সরকারও সন্ত্রাসী সুতরাং আমরা যখন উভয়েই সন্ত্রাসী আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক

সাথে সামনে বাড়া,তাহলে আমি তাদের কাছে ওয়ান্টেড হলাম কেন? নাকি সৌদি সরকার আমার থেকে ভিন্ন?

কেননা সৌদি সরকার যাদেরকে হত্যা করেছে তারা সন্ত্রাসী? ভাল কথা ...।

আমিও তো সন্ত্রাসীদেরকেই হত্যা করেছি।আমেরিকানরা কি সন্ত্রাসী নয়?

ইরাক, আফগানস্থান ফিলিস্তিন সহ অন্যান্য ভূখণ্ডে অ্যামেরিকা যে সন্ত্রাস করেছে, এর চেয়ে বড় কোন সন্ত্রাস হতে পারে?!! আমিও সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করলাম, সৌদি সরকারও সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করল!!

তাহলে আমি কেন সন্ত্রাসী হব? অথচ আমরা উভয় একই কাজ করছি, সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করছি?!! বরং সৌদি সরকারই এমন অনেককে হত্যা করছে যারা সন্ত্রাসী নয় .....।

তারা মার্কিন বাহিনীকে সহায়তার মাধ্যমে ইরাকের সধারন জনগণকে হত্যা করেনি?!!

নাকি সৌদি সরকার আমাকে ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী হিসাবে কাল তালিকাভুক্ত করেছে এ কারণে,আমি ঐ সৈনিকদেরকে হত্যা করেছি যারা অ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে পাহারা ও নিরাপত্তা দিত?!! তাহলে সৌদি সরকার কি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করেনি, যারা সন্ত্রসীদেরকে পাহারা দিত?!! যেমনটি করেছে তারা কাসীমের মধ্যে। অ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদের পাহারাদার আর অন্যান্য সন্ত্রাসীদের পাহারাদারদের মাঝে, কি এমন পার্থক্য বিদ্যমান?!!!

দুই

মনে হয়, এখন আমি বুঝতে পেরেছি .....।

সৌদি সরকার আমাকে ওয়ান্টেড ঘোষণা দিয়েছে কারণ আমি সন্ত্রাসীদের বন্ধু, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল,আর নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসীর বন্ধুও সন্ত্রাসী।

কিন্তু সৌদি সরকার ঘোষণা দেয়নি কি, অ্যামেরিকা তাদের বন্ধু?!!

পৃথিবীর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী কি অ্যামেরিকা নয়?!!

সৌদি ও অ্যামেরিকার মধ্যকার প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা গভীর সম্পর্কের ব্যাপারটা কি নিশ্চিত করেনি?!!

অনুগ্রহ করে আমাকে জবাব দাওঃ

কেন আমি ওয়ান্টেড হলাম?!!!

আমি যেমন সন্ত্রাসী সৌদি সরকারও কি একই রকম সন্ত্রাসী নয়?!!

তাহলে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে তাদের ভ্রাতাকে কীভাবে তারা তাড়া করে?

আমি হত্যা করেছি অ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদের পাহারাদারদেরকে,

সৌদি হুকুমত হত্যা করছে শরয়ী ইসলামী 'সন্ত্রাসীদের" আশ্রয় দাতাদেরকে।

আমি যেমন সন্ত্রাসীদেরকে ভালবাসি তাদের প্রতি সহানভুতি প্রকাশ করি, সৌদি সরকার মার্কিন সন্ত্রাসীদেরকে ভালবাসে, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। বরং তারা এই বন্ধুত্ব নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে থাকে।

তিন

হতে পারে-আমি ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী,

কারণ আমি মুসলিমদের দেশে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি।

কিন্তু .....।

ইরাক মুসলিমদের দেশ,

অ্যামেরিকা ইরাকে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

জঙ্গি বিমান থেকে মিসাইলের আঘাতে পুরো দেশকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে।

অথচ সৌদি, অ্যামেরিকাকে ওয়ান্টেড হিসাবে আখ্যায়িত করে না।

এমনকি শত্রু পর্যন্ত ভাবে না বরং তাদেরকে সাহায্য করে।

সৌদি সরকারের কাছে কোন প্রমাণ আছে, যে আমি সন্ত্রাসীদেরকে কোন সাহায্য করেছি?

যদি থাকে তাহলে ভাল কথা,

একই ভাবে সৌদি সরকারও অ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে, সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

আমি কি তাদের আশ্রয় দিয়েছি?

সৌদি সরকার মার্কিন বাহিনীকে আশ্রয় দিয়েছে।

আমি কি তাদের অস্ত্রের হেফাজত করেছি?

সৌদি সরকার সৌদিকে অ্যামেরিকার অস্ত্রগুদাম বানিয়েছে।

তারা কি আমার কাছ থেকে তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে?

মার্কিন বিমানগুলো সৌদি থেকে ইরাকে যেয়ে তাদের সন্ত্রাস পরিচালনা করছে।

আমি কি তাদেরকে মাল দিয়ে সাহায্য করছি?

অথচ ইরাক-আফগানের যুদ্ধে সৌদি হচ্ছেঅ্যামেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে সাহায্যকারী অন্যতম একটি রাষ্ট্র।

ওহে সৌদি শাসকগুষ্ঠি! তোমরা লক্ষ্য কর, আমরা আর তোমরা উভয়েই সন্ত্রাসের অংশীদার!
হ্যাঁ তবে যদি আমি তোমাদের থেকে আগে বেড়ে থাকি আলহামদুলিল্লাহ্! কেননা আমি মুসলিম।

চার

হ্যাঁ এখন আমার বুঝে এসেছে.....!

আমি সন্ত্রাসী, কেননা আমি সৌদি শাসকদেরকে তাকফীর করেছি।

কিন্তু .....!

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় তো সৌদি সরকারও সাদ্দামকে তাকফীর করেছিল?!!

সৌদি সরকার সাদ্দামকে কেন তাকফীর করল?

এই কারণে তাকফীর করেছে, সে আল্লাহ্ তায়ালার বিধান ছাড়া ভিন্ন বিধানে শাসন পরিচালনা করে? সৌদি সরকারও তো আল্লাহ্ তায়ালার বিধান ব্যতিরেকে ভিন্ন বিধানে শাসন পরিচালনা করে থাকে।

আর আমি তো তাকফীরে এই ফাতওয়া পেয়েছি সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে-শাইয়েখ রহঃ এর ফাতওয়া থেকে, যার ফলে এই

ফাতওয়া সৌদি সরকার বাজারে নিষিদ্ধ করেছে। শায়েখ আবদুল্লাহ বিন হামীদ সহ অন্যান্য শায়েখদের থেকেও একই ফাতওয়া বিদ্যমান আছে।

আর আমি দেখছি বিলাদুল হারামাইনের অধিকাংশ বিষয়ে,

মানব রচিত আইন দ্বারা ফায়সালা করা হয়।

তাহলে কেন তারা সাদ্দামকে তাকফীর করল?

উত্তরঃ এ কারণে, সে একজন বাথিস্ট?

বাথিস্ট কি? এই শব্দে তো ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহের মধ্যে কোন কারণ বিদ্যমান নেই।
তারা কি এ কারণেই কুফর মনে করে না যে, বাথিস্টদের কাছে সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বর মাপকাঠি হচ্ছে দ্বীনের পরিবর্তে জাতীয়তা। ?

সৌদির কাছেও তো সম্পর্ক ও বন্ধুত্বয়ের মাপকাঠি,দ্বীনের পরিবর্তে দেশ ও আরব জাতীয়তার উপর।

বাথিস্টরা কি এ জন্য কাফের,

কেননা তাদের কাছে একজন আজমি মুসলিমের চেয়ে আরবি কাফের শ্রেষ্ঠ? আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সৌদি শাসকদের কাছে একজন আরবি কাফের একজন বাংলাদেশী মুসলিমের চেয়ে উত্তম।

হ্যাঁ যদি আমি এ কারণেই সন্ত্রাসী হই যে,

আমি সৌদি সরকারকে কাফের মনে করি।

তাহলে সৌদি সরকারও এ জন্য সন্ত্রাসী যে,

তারা সাদ্দাম হুসাইন কে কাফের মনে করে।

বরং সৌদি সরকার এ ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে------

১১ সেপ্টেম্বরের মোবারক আক্রমণ পরিচালনাকারী বীরদেরকে সুলতান বিন আব্দুল আযীয তাকফীর করেছে,

সে বলেছে তারা নাকি ইসলামী মিল্লাত থেকে খারেয হয়ে গেছে। তাহলে যে ভাবে আমি ওয়ান্টেড একই ভাবে সুলতান বিন আব্দুল আযীযও যেন ওয়ান্টেড হয়।

রিয়াদের মধ্যে মার্কিন ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ পরিচালনাকারীদেরকে আব্দুল্লাহ তাকফীর করেছে। সুতরাং আমার মত যেন আবদুল্লাহ ওয়ান্টেড হিসাবে গণ্য হয়।

ওরে সন্ত্রাসীর দল!!!

আমাকে ঐ সন্ত্রাস বোঝাও! যেটার কারণে আমাকে তোমরা ওয়ান্টেড আখ্যায়িত করছ।?!!! আমি যা করেছি তা কি অ্যামেরিকা করেনি?!!

বরং এর চেয়ে অনেক অনেক বেশী করেছে।

তাহলে তারা কেন সন্ত্রাসী (জঙ্গি) হচ্ছে না।?!!!

কেন অ্যামেরিকার প্রতি সহানভুতি প্রকাশ অপরাধ বলে বিবেচিত হচ্ছে না?!

যেভাবে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে?!!!

আমাকে কি তোমরা নাসারা (খ্রিস্টান) হতে বলছ?

কুফরী করতে বলছ? তাহলে অ্যামেরিকার মত আমি এই সন্ত্রাসের অপরাধ থেকে মুক্তি পাব?!!

এটাই কি সৌদি সরকার আমার থেকে আশা করে?!

ইহুদী-নাসারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম গ্রহণ কর।

সৌদি সরকার সন্ত্রাস করেছে।

সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখিয়েছে।

সন্ত্রাসীদেরকে সাহায্য করেছে।

তাদেরকে মাল দিয়ে শক্তিশালী করেছে।

মার্কিন সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে সব করেছে।

তথাপি কেন তারা জঙ্গি-সন্ত্রাসী হবে না?!!

এই কারণে কি, তারা হচ্ছে একটা হুকুমত বা সরকার?!!

তাহলে আমার উপরও তো আবশ্যক হচ্ছে,

যে কোন ভাবে ক্ষমতা দখল করা।

যাতে আমিও এই সন্ত্রাসের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাই।

পাঁচ

আচ্ছা ঠিক আছে .....।।

যা আলোচনা হল সব বাদ।!!!

যদিও আমি কোন অভিযোগ ব্যতিরেকেই অভিযুক্ত, যে সৌদি সরকার আমাকে ওয়ান্টেড আখ্যায়িত করেছে, যদিও সে আমার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধে অপরাধী, তথাপি আমি নিজেকে সমর্পণ করব .....।!

তবে আমি কিছু শর্ত দেব ----------।

আমি এমন শর্ত দেব না, যার হক শরীয়ত আমাকে দেয়নি।

আমর প্রথম শর্ত হবে,

আমার ফায়সালা করতে হবে শরয়ী মাহকামাতে,

ইনসাফের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ্য মাহকামা।আমার আর একটি শর্ত হচ্ছে,

আমাকে নির্যাতন করা যাবে না।

আমার শেষ শর্ত হচ্ছে,

আমার যে সমস্ত আপনজনকে সরকার জিম্মি হিসাবে আটক করেছে,

তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে।

হ্যাঁ এগুলোই আমার শর্ত।

কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে,

সৌদি সরকার আমাকে জেলে ভরবে,

আমার সকল শর্ত অস্বীকার করবে।

তাহলে আমার পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে,

সরকারকে এই শর্ত পুরনে বাধ্য করতে

অথচ আমি জিন্দানখানায় শিকলাবদ্ধ।

একটা সমাধান পেয়েছি --------।

আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এর সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোন শায়খের কাছে যাব।

তিনি হতে পারেন, সাফার আল- হাওালী।

আমি তার কাছে আমার শর্তগুলো পেশ করব,

তাকে এ ব্যাপারে সরকারের সাথে আলোচনা করতে বলব।

তিনি যে এটা করতে সক্ষম হবেন, আমি এই নিশ্চয়তা পাব কীভাবে?

হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে যে,সরকার শর্ত মানলে তাকে এ ব্যাপারে মিডিয়ার মধ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে হবে।

কিন্তু.....!
এই একই কাজ কি ফাকআসী করেননি?

ফাকআসীর শর্তগুলো হেওালি কি সৌদি পত্রিকার সমূহের মধ্যে প্রকাশ করেননি?

তথাপি ফাকআসী তার হক সমূহের নিশ্চয়তা পেয়েছে কি?!!

না পায়নি!!!

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি নায়েফ দৃশ্যপটে এলো,

এসে হেওালিকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল।

ফাকআসীর শর্ত সমূহ অস্বীকার করল।

নায়েফের দাবি অনুযায়ী হেওালি মিথ্যা বলেছিল কি?

না এটাই স্বাভাবিক যে নায়েফ হেওালিকে মিথ্যার অপবাদ দিয়েছে?

তাহলে দুর্বল কারাবন্দী ফাকআসীর ক্ষেত্রে কি অবস্থা হয়েছে?!!

আর কে আছে এমন, যে ফাকআসীর শর্তের নিশ্চয়তা দেবে, তার জামিন নেবে?

আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা থেকে সরে এসেছি,

কারণ আমি যে সতর্কতাই নিতে চাই, ফাকআসী তাই গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

তাই মৃত্যুই আমার কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয় .....।

ছয়

যদিও আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা বাদ দিয়েছি, কিন্তু সন্ত্রাসের অভিযোগ থেকে মুক্ত হবার দিঢ় সংকল্প থেকে পিছে সরে আসতে পারিনি।

সন্ত্রাসের সকল উপকরণ দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে অ্যামেরিকা।

তাদেরকে সন্ত্রাসের সকল সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়।

অথচ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো অ্যামেরিকার ভালবাসা অর্জনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, আমাকে অপরাধী সাব্যস্তকারী সৌদি সরকার এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রগামী।

অ্যামেরিকার সাথে বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও ভালবাসা তাদের জন্য গর্বের ব্যাপার কেন?

অথচ আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ অপরাধ!!!

যে রাষ্ট্র মার্কিন সন্ত্রসিদেরকে সাহায্য করে,

তার সাথে সম্পর্ক রাখা জনগণের উপর ওয়াজিব কেন?!!

আর শরয়ী জঙ্গিদের (সন্ত্রাসীদের) ব্যাপারে সামান্য সহানুভূতি প্রকাশ জনগণের জন্য হারাম কেন?!!

সন্ত্রাসী সৌদি সরকারকে সাহায্য করা, কেন জনগণের উপর আবশ্যক?

আর আমাদেরকে সাহায্য করা হারাম?!!

আমি কারণ খুঁজে পেয়েছি .....

হ্যাঁ... হ্যাঁ... আমি এখন কারণ বুঝতে পেরেছি .....।

আমি উসামা রহঃ এর আওয়াজ শুনতে পেলাম ----------

إنَّ الناس يميلون مع القوي .. إرهابُنا جريمة .. وإرهاب أمريكا أمر مشروع .. أبرياؤهم أبرياء .. و أبرياؤنا ليسوا أبرياء

মানুষেরা ঝোঁকে শক্তিশালীর দিকে ...।।

আমাদের "সন্ত্রাস" হচ্ছে অপরাধ

আর অ্যামেরিকার সন্ত্রাস হচ্ছে বৈধ।

তাদের নিরাপরাধ জনসাধারণ নিরাপরাধ

আর আমাদের নিরাপরাধ জনসাধারণ অপরাধী।!!

আল্লাহ্ তায়ালা আপনার প্রতি রহম করুন, হে উসামা!এখন বুঝেছি কবিতার পংতি।

এখন চিনেছি ঘোড়ার লাগাম।

এখন পেয়েছি সমস্যার সমাধান!

হ্যাঁ এখন বুঝেছি.....।।

আমাকে শক্তিশালী হতে হবে।

যখন তুমি শক্তিশালী হবে,

তখন তুমি যাই কর সন্ত্রাসী হবে না।

ঠিক আছে!!!

কিন্তু আমি যে দুর্বল এটা তাদেরকে কে বলল?

হয়ত আমি শক্তিশালী কিন্তু সেটা তারা জানে না!!?

আচ্ছা!!
তাদেরকে আমার শক্তি দেখাতে হবে,

যেমন তারা অ্যামেরিকার শক্তি দেখেছে।

আর তখনি আমার সাথে ক্ষমতাশীলরা

উষ্ম বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে।

তখনি সৌদি শাসক নড়েচড়ে বসবে,

আমার সাথে চুক্তি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

এই শাসকেই তো শ্যরন এর সাথে চুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে ছিল।

ইয়াহুদী সন্ত্রাসী শ্যরন কি একজন মুসলিম জঙ্গির চেয়ে ভাল?!!!

সন্ত্রাসের (জঙ্গিবাদের) অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার এক মাত্র উপায় হচ্ছে ---

তোমাকে শক্তিশালী হতে হবে।

ঠিক আছে .....।

কিছু সময় অপেক্ষা কর .....।

অচিরেই ইনশাআল্লাহ্ তোমরা আমরা শক্তি দেখতে পাবে .....।।

এটাই ইসলামী সন্ত্রাসীর বার্তা...।।

হে আল্লাহ্!

আপনি মুজাহিদিন সন্ত্রাসীদের ত্রাসকে আপনার পথে কবুল করুন।

হে আল্লাহ্! আপনি নিহত জঙ্গিদের রূহগুলোকে আপনার পথে গ্রহণ করুন।

https://www.facebook.com/notes/ahmad...০৯৭২৫২৬২৭৯৩৪১৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৯১৭

উম্মাহর নেতৃত্বদানে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী

Ahmad Faruq M

Senior Member

০৪-১৫-২০১৭

***

الصفات المهمة

لقيادة الأمة

সংকলন ও বিন্যাস:

শায়খ ইসমাঈল ইবনে আব্দুর রহীম

‘আবু হাফ্স আল-মাকদিসি’

উৎসর্গ

এই কিতাবটি উৎসর্গ করছি:

— আগ্রাসনের কালো থাবা ও স্বৈরাচারি শাসনব্যবস্থার জুলুম থেকে মুক্তিকামী মুসলিম উম্মাহর প্রতি। যে শাসনব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহকে রাব্বুল আলামিনের শরীয়ত থেকে দূরে রেখেছে।

¬ আমার সম্মানিত পিতা-মাতার প্রতি। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন এবং তাদেরকে সুউচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউসে আবাস দান করুন!

¬ ঐ সকল ভাগ্যাহত বন্দীদের প্রতি, যারা জীবনের শ্রেষ্ঠ মূহুর্তগুলো তাগুতদের কারাগারসমূহে অতিবাহিত করছেন।

¬ আল্লাহর পথে দাওয়াত ও কিতালের ভূমিসমূহে অবস্থানকারী সকল মুজাহিদ ও মুরাবিতদের প্রতি, বিশেষত: দখলকৃত মসজিদে আকসার মুরাবিতীনের প্রতি!

¬ ঐ সকল জিহাদী শায়খ ও আলেমদের প্রতি, যারা সম্মানের মুকুট, পৃথিবীর অপরিহার্য অঙ্গ।

¬ উম্মাহর সেনাবাহিনীর ঐ সকল ভাইদের প্রতি! যারা কষ্টের উপর অবিচল রয়েছেন এবং নিকট-দূর সকলের অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছেন।

¬ আমার স্ত্রীর প্রতি, যিনি আমার সঙ্গে একসাথে জেলখানা,সফর ও চিকিৎসার কষ্ট-কাঠিন্য সহ্য করেছেন.. আমার পুত্র কণ্যা,ভাই,বোন,পরিবার ও চাচা-চাচিদের প্রতি।

¬ শহীদদের পিতা মাতা ও স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি! আহত উম্মাহর জখমী ও শোকসন্তপ্তদের প্রতি।

¬ আমার উপর অধিকার রাখে,এমন সকলের প্রতি।

ভূমিকা:-

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অসহায়দের সাহায্যকারী, তাওহীদবাদীদের সম্মানিতকারী এবং কাফের ও মুনাফিকদের প্রতি কঠোরতাকারী। দরূদ ও সালাম তাওহীদবাদীদের ইমাম ও মুজাহিদদের নেতার প্রতি এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার নির্দেশিত পথে চলবে তাদের প্রতি।

নিশ্চয়ই সর্বাধিক সত্যবাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ নবী মুস্তফা সা: এর পথ। অত:পর:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন স্ব স্ব

কওমকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। মিথ্যা,জুলুম ও অত্যাচারের অন্ধকার থেকে ইনসাফ, দয়া, উত্তম চরিত্র ও উন্নত সামাজিক মূল্যবোধের দিকে নিয়ে আসার জন্য। যেমনটা রিবয়ী ইবনে আমের রা: বলেছেন:

نحن قوم قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جورالأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

"আমরা এমন সম্প্রদায়, আমাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে মানুষের রবের দাসত্বের দিকে নিয়ে আসার জন্য, সকল ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসার জন্য।" (ইবনে কাসীর রহ: আলবিদায়া ওয়াননিহায়ায় ইহা উল্লেখ করেছেন। এর সনদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।)

এগুলো অল্প কিছু কথা, কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। কারণ এতে তিনি(রাঃ) সেই মহান দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা আখিরী উম্মাহর উপর অর্পণ করেছেন। আর তিনি এই উম্মাহর জন্য যে পথ নির্ধারণ করলেন তা হচ্ছে- إخراج الناس من الظلمات إلى النور "মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসা"।

এবার আমরা দেখি, আমাদের অবস্থা কি? আমরা তো দেখছি, আমাদের উম্মাহর অনেক লোক সে পথ থেকে বের হয়ে গেছে,ফলে তারা নিজেরাও বক্র হয়েছে, অন্যদেরকে বক্রপথে নিয়েছে এবং ধোঁকা,জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তার নবী মুহাম্মদ সা: কে এমন এক যুগে প্রেরণ করেছেন,যে যুগ দেখেছে এমন জুলুম, পথভ্রষ্টতা ও শিরক,যার উপমা পৃথিবী কখনো দেখেনি এবং দেখবেও না। সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সা: ঈমানী বন্ধনের ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ধরাধামে আগমন করলেন ইসলামের বার্তা,তাওহীদ ও হেদায়াতের আলো নিয়ে। তিনি ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলোকে পরিশুদ্ধ করলেন। সমাজকে পথভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা,জুলুম ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে ইনসাফ,দয়া ও সাম্যের দিকে নিয়ে আসলেন। যাতে কোন আরবীর জন্য অনারবীর উপর তাকওয়া ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ফলে এটা সেই মর্যাদাকর বিষয়ে পরিণত হল,যার ব্যাপারে সমস্ত মাখলুক (সৃষ্টি) প্রতিযোগীতা করবে,তথা তাকওয়া,আল্লাহর নৈকট্য ও তার সরল দ্বীনের শিক্ষাসমূহ বাস্তবায়ন।

এর মাধ্যমেই নবী সা: তার সাহাবীদেরকে সর্বিকভাবে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিলেন। যার মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের দিকও। একারণেই ইতিহাস আজও পর্যন্ত তাদের মত নেতৃত্বদানকারী ও পরিচালনাকারী দেখেনি। আর এমনটা হবে না কেন? তারা তো আদম সন্তানের সরদার, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী নবীর হাতে শিক্ষা লাভ করেছেন।

নবী সা: এর নেতৃত্ব ছিল প্রকৃত অর্থেই অতুলনীয় নেতৃত্ব। তার নেতৃত্বের প্রশংসা করার মত কি যোগ্যতাই বা আমার আছে? তিনি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের ভিত্তিকে এমন একটি কাঠামোর উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার বর্ণনা কোন মানুষ দিতে অক্ষম। ফলে স্বল্প দিনের মধ্যে সর্বপ্রকার আভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে ফেললেন। তাঁর সমাজকে এমন আদর্শ ও সুসভ্য সমাজ রূপে গড়ে তুললেন, যা সামাজিক উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ স্তর লাভ করেছিল। অনুরূপই ছিল তার পররাষ্ট্রনীতি।

তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইচ্ছানুযায়ী কিছু গোত্রের সাথে মিত্রতা গঠন করলেন এবং কিছু গোত্রের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করলেন। তিনি বিভিন্ন রাজা- বাদশাহদের নিকট প্রেরিত তার দূতদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে মনোনীত করতেন। তাই আমর ইবনে আস রা: কে আম্মানের বাদশার প্রতি দূত হিসাবে মনোনীত করলেন। হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রা: কে মিশরের বাদশা মুকাওকিসের প্রতি দূত হিসাবে মনোনীত করলেন। নিজের জন্য একটি আংটি বানালেন, যেন তার যুগের অন্যান্য বাদশাহদের সাথে মিল রাখতে পারেন।

তিনি সা: যখন মদীনার বাইরে যেতেন, তখন মদীনার কার্যাদী পরিচালনার জন্য তার সাহাবীদের মধ্যে কাউকে শাসক বানাতেন। এই ধারাবাহিকতায় একবার আলী রা:কে শাসক বানালেন,একবার উসমান রা:কে শাসক বানালেন।

তিনি বিভিন্ন ক্ষুদ্র দল বা বড় বাহিনীর জন্য উদ্দিষ্ট শহর বা কওমের বংশ বিবেচনাপূর্বক এবং নিজ সাহাবাদের যোগ্যতার ব্যাপারে স্বীয় ধারণার আলোকে কোন উপযুক্ত লোককে আমির বানাতেন। এজন্য একবার আমির বানিয়েছিলেন আবু বকরকে,একবার আলীকে, আবার কখনো আমর ইবনুল আসকে,খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে,আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে বা উসামা ইবনে যায়দকে (অথচ তিনি বয়সে অনেক ছোট ছিলেন)।

যে সাহাবী যে প্রাকৃতিক বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হতেন,তিনি তার সেই গুণটিকে আরো বাড়িয়ে তুলতেন। প্রত্যেককে সেই গুণের আলোকে কোন উপাধি দিতেন। তারপর তাকে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন,যা ঐ বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার প্রতি তার আত্মবিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করত।

হ্যাঁ,তা ছিল এমন এক শিক্ষা,যা পৃথিবী পূর্বেও কখনো দেখেনি এবং পরেও দেখবে না। যে শিক্ষা রাসূলুল্লাহ সা: এর যুগকে সর্বকালের সেরা যুগে পরিণত করেছিল। তাই আমি সেই যুগের যতই প্রশংসা করি,তার শ্রেষ্ঠত্ব যতই বর্ণনা করি,কখনো তা শেষ করতে পারবো না।

আজ মুসলিমদের নেতৃত্ব ঠিক সেভাবে গড়ে তোলা অতীব জরুরী, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সা: তার সাহাবীদেরকে গড়ে তুলেছিলেন। বিশেষত: যেহেতু আমরা এমন এক যামানায় নেতৃত্বশূণ্য হয়ে পড়েছি,যখন ফেৎনার ঢল ঢেউয়ের ন্যায় একটির উপর আরেকিট আছড়ে পড়ছে। উম্মাহ আজ এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনবোধ করছে,যে তাদেরকে সেই বিভেদ,দলাদলি,হিংসা, হানাহানি, বিভ্রান্তি, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও জুলুম থেকে মুক্তি দিবে,যা খেলাফতের পতন,অত:পর বৃটেন ও ফ্রান্সের হাতে সকল দেশগুলো ছোট ছোট রাজ্যে পরিণতি হওয়ার পর থেকে অধিক পরিপুষ্ট হয়েছে।

এই উম্মাহর আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন এক নেতৃত্বের, যে হবে প্রজ্ঞাশীল,কুরআন-সুন্নাহর আলেম। তার জাতি যে পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে তা গভীরভাবে অনুধাবন করবে। অত:পর তার বিরুদ্ধে অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকেও তার আলোকে চিন্তা করবে। যেটা নবী সা: স্পষ্টভাবে বলেছেন:

"يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها " ، فقال قائل :ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال: " بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن" ، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا، وكراهية الموت."

“অচিরেই সকল জাতি-গোষ্ঠী পরস্পরকে তোমাদের বিরুদ্ধে আহ্বান করবে,যেমন

খাবার প্লেটে একজন আরেকজনকে আহ্বান করে। একজন বলল, সে দিন আমাদের সংখ্যা কম থাকার কারণে এমনটি হবে? রাসূল সা: বললেন: বরং সেদিন তোমরা অনেক বেশি থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে ¯স্রোতে প্রবাহমান আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন আর তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢেলে দিবেন। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ওয়াহান কি? তিনি বললেন: দুনিয়ার ভালবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা"।
(বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ।)

এই নেতৃত্বের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হল উম্মাহর প্রতিটি সদস্য, দল ও অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষণ প্রদান,উম্মাহর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন উন্নয়নশীল কর্মসূচি বাস্তবায়ন,বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা,যত বেশি সম্ভব উলামা, চিন্তাবিদ,রাজনৈতিক ও জিহাদী নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করা এবং এমন অনেক সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে,যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সা: এর সুন্নাহর আলোকে এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে,জীবনের সকল বিষয়ে যার থেকে সমাধান নেওয়া হবে।

যে সকল বিষয় বুঝা কখনো কখনো কারো জন্য কঠিন হয়ে পড়ে,সেগুলোতে উম্মাহর পূর্বসূরীদের বুঝের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। যেন সর্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ এমন একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়,যার লক্ষ্য হবে "খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ" ফিরিয়ে আনা এবং 'ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ' পুনরায় বাস্তবায়ন করা।

ইসলামে প্রতিপালন মূলক নেতৃত্ব

ইসলামে প্রতিপালন মূলক নেতৃত্ব কোন চাকুরী বা ক্ষমতা নয়। বরং এটি জীবনের একটি আদর্শ। জীবন পরিচালনার পদ্ধতি। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে খেলাফত বাস্তবায়ন করা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা,তার আদেশগুলো পালন করা এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা।

এর দ্বারা নেতৃত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গি আর পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা যারা দুনিয়া-আখিরাত উভয়টার জন্য কাজ করে আর যারা কেবল দুনিয়ার জন্য কাজ করে

এই দুই শ্রেণীর মাঝে বিস্তর ব্যাবধান থাকে। একারণে প্রত্যেক সংজ্ঞা দানকারীর

দৃষ্টিভঙ্গি ও সামগ্রীক পরিবর্তনশীল উপাদানগুলোর কারণে এর সংজ্ঞার মধ্যেও পার্থক্য হবে। যেমন পরিপার্শ্বিকতা,বিভিন্ন রাজনৈতিক,সামরিক,সামাজিক,মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ এবং অভিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য হয়।

উম্মাহর জন্য নেতৃত্ব,দেহের জন্য আত্মার ন্যায়। এটি এমন জিনিস,যা দেহকে নাড়া দেয়, তাতে আনন্দ ও প্রশান্তির অনুভূতি দেয়। এমন জিনিস,যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অধিক ব্যাথিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আনন্দ ও উচ্ছাসের অনুভূতি দেয়। তাই উম্মাহর নেতৃত্বই হচ্ছে তার দেহের প্রধান পরিচালক। নেতৃত্বই তাকে আশঙ্কাজনক বিষয় থেকে দূরে থাকার দিকনির্দেশ করে এবং দেহকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ রক্ষণাবেক্ষণ করে। যেন উম্মাহর জীবন সর্বোত্তমভাবে পরিচালিত হয়।

রাসূল সা: বলেন:

" ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ."

رواه البخاري في صحيحه

পরস্পর দয়া,ভালবাসা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে দেখবে একটি দেহের ন্যায়, যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে তার জন্য পুরো দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে কাটায়। (ইমাম বুখারী রহ: সহীহ বুখারীতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

আজ উম্মাহর জন্য স্ব-রাষ্ট্রনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি অঙ্গনে প্রজ্ঞাবান একটি নেতৃত্বের খুবই প্রয়োজন। যা প্রতিটি বিষয়কে সঠিক পরিমাণে ও সঠিক স্থানে রাখবে। যেন উম্মাহর সন্তানদের মাঝে শরয়ী শাসনব্যবস্থার প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে। যা এক শ্রেণীর অজ্ঞদের কর্মকান্ডের কারণে অনেকের কাছেই ভয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উম্মাহ প্রতীক্ষা করছে কে তাদেরকে শত্রুদের কবল থেকে এবং উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী তাগুত শাসকদের কবল থেকে তাদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে দিবে। যারা তাদেরকে যুগ যুগ ধরে শাসন করে আসছে। উম্মাহ অনেক বেশি প্রয়োজনবোধ করছে এমন এক নেতৃত্বের, যা তাদের উপর সহনশীল হবে, তাদের প্রতি কোমল হবে,তাদের সাথে নম্রতা ও ভালবাসার আচরণ করবে এবং তাদের প্রতি দয়াশীল হবে আর তাদের শত্রুদের প্রতি হবে কঠোর। যেমন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তার সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র। তুমি তাদেরকে দেখবে (কখনও) রুকুতে,(কখনও) সিজদায়,আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানে রত। তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিস্ফুট, সিজদার ফলে। এই হল তাদের সেই গুণাবলী,যা তাওরাতে বর্ণিত আছে। আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত এই, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপর তাকে শক্ত করল। তারপর তা পুষ্ট হল। তারপর তা নিজ কান্ডের উপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, তা কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে ফেলে। এটা এইজন্য যে, আল্লাহ তাদের (উন্নতি) দ্বারা কাফেরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" (আল-ফাৎহ ২৯)

এমন নেতৃত্ব,যা মুসলমানদের জ্ঞান-বুদ্ধির সম্মান ও মূল্যায়ন করবে;তাকে উপহাসের বস্তু বানাবে না ।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"(হে নবী!) তারপর আল্লাহর রহমতই ছিল,যদ্দরুন তাদের প্রতি তুমি কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয় হতে,তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর,তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কর এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরার্শ করতে থাক। অত:পর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) মনস্থির করবে,তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।" (আলে

ইমরান:১৫৯)

সকল মানুষের সাথে কোমল আচরণ করা ইসলামের একটি উন্নত বৈশিষ্ট্য। এমন ব্যক্তিই এই গুণে গুণান্বিত হতে পারে,ঈমান যার হৃদরেয় গভীরে প্রবেশ করেছে,চেতনায় ও কর্মে দৃঢ়ভাবে স্থান করে নিয়েছে। যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে যে,কোমলতাই সৌভাগ্য,শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের চাবিকাঠি। উম্মাহ আজ কতই না প্রয়োজনবোধ করে এমন একটি নেতৃত্বের, যে তাদের সাথে কোমল আচরণ করবে,তাদেরকে নতুন করে জেগে উঠতে সাহায্য করবে!!

আবুদ্দারদা রা: এর সূত্রে রাসূল সা: থেকে বর্ণিত, রাসূল সা: বলেন:

مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ ، فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حُسْنُ الْخُلُقِ

“যাকে তার কোমলতার ভাগ দেওয়া হয়েছে, তাকে তার কল্যাণের ভাগ দেওয়া হল। আর যাকে তার কোমলতার ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে তার কল্যাণের ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হল। কিয়মাতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি বস্তু হবে তার উত্তম চরিত্র।” (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী।)

ইসলাম আমাদেরকে কোমলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, তার দিকে আহ্বান করেছে ও উৎসাহিত করেছে। ইসলাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছে যে,যে ব্যক্তি কার্যগতভাবেই কল্যাণের প্রেমিক ও তার প্রতি আগ্রহী হয়,কোমলতার প্রভাব ও ফলাফল তাকে সকল কর্মকান্ডে কোমলতা অনুসন্ধান করতে বাধ্য করবে। সুতরাং কোমলতা হল,সকল আমলের সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জল্য। যা তার শ্রেষ্ঠত্বের একটি রহস্যও বটে। হযরত: আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা: এর সূত্রে রাসূল সা: থেকে বর্ণিত: **إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَرْضَاهُ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ**

“নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার প্রতিদান হিসাবে এমন বিষয় দান করেন,যা কঠোরতার দ্বারা দান করেন না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:।)

আমি পূর্বে মুসলিম নেতৃত্বের গুণাবলীর সম্পর্কে একটি কিতাব লিখেছি। এখানে উক্ত কিতাবে উল্লেখিত গুণগুলোর উপর আরো দুইটি গুণ বর্ণনা করবো। গুণ দু'টি হচ্ছে: 'বীরত্ব' ও 'পরামর্শ করা'। আল্লাহর এই মুখাপেক্ষী বান্দার অভিমত হচ্ছে, এই ন'টি গুণ হল এমন গুণ, যা একজন মুক্তিদাতা নেতার (যদি উপাধিটি সঠিক হয়ে থাকে) মাঝে বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত জরুরী।

উক্ত গুণগুলো হচ্ছে:

العلم- الحلم- الحكمة- الحزم- الجود- الخطابة- الشجاعة- الشوري- الصدق

ইলম, সহনশীলতা, প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা, দানশীলতা, বাগ্মিতা, বীরত্ব,পরামর্শ ও সততা।

যদিও আরো অনেক গুণাবলী রয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি, এগুলো হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই কিতাবের বাকে বাকে এসকল গুণগুলোর স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথম গুণ: العلم/ ইলম

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"আর বল,হে প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও"

ইলম:

আভিধানিক অর্থঃ- জানা। যেমন: বলা হয়: **علم الشيئ يعلمه علما**(সে বিষয়টির ইলম অর্জন করেছে বা করবে।) অর্থাৎ সে জেনেছে বা জানবে।

পারিভাষিক অর্থ:

'কোন জিনিসের প্রকৃত তত্ত্ব জানা'।

কেউ বলেছেন, 'জ্ঞাত জিনিসের ব্যাপারে অস্পষ্টতা দূর করা'। আর জাহালত বা অজ্ঞতা হল তার বিপরীত।

কেউ বলেন, এর কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। কেউ বলেন,'ইলম এমন একটি প্রোথিত গুণ, যার দ্বারা সামগ্রীক ও একক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করা যায়'।

আমরা সেই ইলমের আলোচনা দিয়ে শুরু করবো,যে ইলমের আলোচনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তার নবী সা: এর সঙ্গে কথা শুরু করেছেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (আলাক:১)

অন্য আয়াতে বলেছেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

"তাই জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর নিজের গুনাহর জন্য এবং মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমার গতিবিধি ও অবস্থানস্থল সম্পর্কে জানেন।" (মুহাম্মদ:১৯)

হাসান ইবনে ফযল রহ: বলেন: 'তাই তোমার ইলমের উপর আরো ইলম বৃদ্ধি কর'।
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহীর সূচনাই হল ইলম দিয়ে। ইলম হচ্ছে একটি নূর, যার মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। যাতে তাদের জীবন তার সন্তুষ্টি মত পরিচালিত হয়।

মানুষের ইলম যত বৃদ্ধি পায়,আপন রবের প্রতি,নিজ আত্মার প্রতি এবং স্বীয় দাওয়াত সঠিক ও হক হওয়ার প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাস তত বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত দাওয়াত বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ়তার সাথে পথ চলার হিম্মতও বৃদ্ধি পায়। যেন সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ বান্দার নিকট আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে যায়।

ইলম যদি ব্যাপকভাবে সবার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলে গণ্য নাও হয়,তথাপি একজন মুসলিম নেতার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণগুলোর মধ্যে ইলম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটা অন্যান্য গুণগুলোর সাথেও জড়িত। কেননা কিছু গুণ রয়েছে,যেগুলো ইলম ছাড়া অস্তিত্বেই আসতে পারে না। যেমন সহনশীলতা। এটা ইলমের সাথে পরিমিত হওয়া অনিবার্য। এমনিভাবে দৃঢ়তা ও বীরত্বের গুণদ্বয়ও।

এমনিভাবে প্রতিটি গুণই কোনও না কোনভাবে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ইলম হল সকল গুণগুলোর উৎস ও ভিত্তি।

একজন নেতা এক মুহূর্তের জন্যও এ গুণটি হতে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে যে স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং যে গুরুদায়িত্ব তাকে দিয়েছেন,সে দায়িত্বের জন্য যতটুকু ইলম প্রয়োজন,ততটুকু ইলম অর্জন

করা তার উপর ফরজ। আর এই ইলম অর্জন করা হবে আল্লাহর কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে। এবং সবশেষে সঠিক উৎস হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচার অনুসন্ধানের মাধ্যমে। এছাড়া বিভিন্ন ঘটনায় রাসূল সা: বা সাহাবীদের আমল সম্পর্কে অবগত হওয়া,তাতে চিন্তা করা,অত:পর আমাদের যামানায় তার অনুরূপ ঘটনাবলীকে তার সাথে কিয়াস করার মাধ্যমেও সমাধান লাভ করা যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কারণ ইলমের বিষয়টি আরও ব্যাপক। শুধু এগুলোর উপরই ক্ষ্যান্ত থাকা সঠিক নয়। কারণ অনেক সময় আমাদের যামানায় এমন বিষয় সংঘটিত হয়,যার অনুরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে রাসূল সা: বা সাহাবাগণের অবস্থান দেখলে মনে হয়,আমাদের যামানায় এর থেকে ভিন্নটা উত্তম।

স্পষ্ট করার জন্য বলি: কখনো কোন লোক কোন একটি ঘটনায় কঠোর আচরণ অবলম্বন করার পক্ষে রাসূল সা: এর এমন একটি ঘটনা দিয়ে দলিল দিল,যাতে রাসূল সা: কঠোর আচরণ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু লোকটি উক্ত ঘটনার সময় বোঝেনি। কারণ রাসূল সা: কঠোর আচরণ অবলম্বন করেছিলেন মদীনায় হিজরতের পরে। পক্ষান্তরে মক্কায় থাকাকালে এমন ঘটনার ক্ষেত্রে 'ক্ষমা ও মার্জনা'ই ছিল তার একমাত্র কথা। এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এরই আদেশ দিতেন। আর উক্ত হুকুমটি আমাদের বর্তমান যামানায় আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কারো নিকট অস্পষ্ট নয় যে,বর্তমানে শাসন ও ক্ষমতা অমুসলিমদের হাতে। যা একটা সীমা পর্যন্ত রাসূল সা: ও সাহাবায়ে কেরামের মক্কার অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে। রাসূল সা: সে সময় অন্যায়কে বাঁধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। আমি যা জানি,তাতে এরকম কোন ঘটনা নেই যে, রাসূল সা: যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোন কাফেরকে হত্যা করেছেন বা শাস্তি দিয়েছেন।

যাইহোক,মক্কী জীবনে রাসূল সা: শুধু আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন আর ক্ষমা করে যেতেন। অর্থাৎ সে সময় রাসূলুল্লাহ সা: এর একমাত্র কাজ ছিল তার রবের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, যেহেতু তখন মুসলিমগণ ছিলেন দুর্বল। যাতে কাফেররা রাসূলুল্লাহ সা: এর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ দলিল পেয়ে যায় এবং পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সা: থেকে তাদের নিকট অপছন্দনীয় বিষয়গুলো দেখলে তার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। অর্থাৎ তাদের অহংকার ও জুলুমের কারণে যেগুলোকে অপছন্দ করে।

আমাদের বর্তমান অবস্থাটিও ঠিক অনুরূপ। কেননা বর্তমানে এমন অনেক অমুসলিম রয়েছে, যাদের ইসলামের ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই,চাই পাশ্চাত্যের হোক বা আমাদের সমাজের খৃষ্টানরাই হোক। এমনকি অনেক মুসলিমও এমন রয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের বিশুদ্ধ নিদর্শনগুলো থেকে যে যত দূরে,তার অজ্ঞতার পরিমাণও সে স্তরের। একারণে এখন যদি 'নাহি আনিল মুনকার' করতেই হয়,তাহলে নম্রতা থেকে ধাপে ধাপে কঠোরতার দিকে যেতে হবে। অত:পর এই নম্রতার কথা সমস্ত সৃষ্টির কর্ণকুহরে ও দৃষ্টির সামনে এমনভাবে পৌঁছে দিতে হবে, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সা: যখন মক্কায় মানুষকে দাওয়াত দিয়েছিলেন,তখন নিকট-দূরের প্রতিটি গোত্রই মুশরিকদের প্রতি রাসূল সা: এর ক্ষমা ও মার্জনার বিষয়ে ব্যাপকভাবে জেনে গিয়েছিল।

কিন্তু এর বিপরীত করলে এই দ্বীনকে বিকৃতভাবে চিত্রায়িত করা হবে। যা বর্তমানে হয়েছেও। 'সন্ত্রাস ও কট্টরপন্থী' তকমা গায়ে লেগেছে। এমনকি যখনই তাদের আলোচনা সামনে আসে, তখনই এই চিত্রটি ভেসে উঠে। আর এটা শুধু সেই অজ্ঞতার কারণে,যা-নিজেদেরকে উম্মাহর নেতৃত্বদানের অধিকারী দাবিকারী- কিছু লোককে এমন কাজে লিপ্ত করিয়েছে,যা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন ও তার শরীয়ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টাকে উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ সা: হুদুদ কায়েম করা ও হত্যাযোগ্য লোকদেরকে হত্যা করার কাজ তখনই শুরু করেছেন,যখন কাফেররা ও অন্য সবাই এই দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ দলিল পেয়ে গিয়েছিল। এমনকি তারা একথাও জেনে গিয়েছিল যে,রাসূলুল্লাহ সা: এর দয়া,তার কঠোরতার উপর প্রবল এবং তার নিকট কঠোরতা থেকে দয়া ও করুণাই অধিক প্রিয়। ফলে তিনি যখন

মদীনায় কঠোরতার আচরণ গ্রহণ করলেন,তখন কাফেরদের কোন ছোট প্রমাণও অবশিষ্ট রইল না।

এমন পরিবেশ তিনি একদিনে বা একরাতে প্রস্তুত করেননি।

ইমাম সারাখসী রহ: বলেন:

انْ الْأَمْرَ بِالْجِهَادِ وَبِالْقِتَالِ نَزَلَ مُرَتَّبًا. فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) مَأْمُورًا فِي الِابْتِدَاءِ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ...ثُمَّ أَمَرَ بِالْمُجَادَلَةِ بِالْأَحْسَنِ ... ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ ... ثُمَّ أُمِرُوا بِالْقِتَالِ إنْ كَانَتْ الْبِدَايَةُ مِنْهُمْ ... ثُمَّ أُمِرُوا بِالْقِتَالِ بِشَرْطِ انْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ... ثُمَّ أُمِرُوا بِالْقِتَالِ مُطْلَقًا.(

"জিহাদ ও কিতালের আদেশ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা: প্রথমে শুধু রিসালাত পৌঁছানো আর কাফেরদেরকে এড়িয়ে চলতে আদিষ্ট ছিলেন। তারপর উত্তম পন্থায় বিতর্ক করার আদেশ পান। তারপর যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর যুদ্ধের আদেশ করা হয়,যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হয়। তারপর তাদেরকে হারাম মাস সমূহ অতিক্রম করার শর্তে কিতালের আদেশ দেওয়া হয়। তারপর ব্যাপকভাবে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়"।

আমি এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করলাম। কারণ,আপনারা জেনেছেন,আমাদের দেশগুলোতে এমন কর্মকান্ড শুরু হয়েছে,যেগুলোকে ইসলামী মনে করা হয়,অথচ ইসলাম এগুলো থেকে মুক্ত। একারণেই মুসলিম নেতৃত্বের উপর আবশ্যক ছিল সর্বদা ইলম অর্জনের চেষ্টা করা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নির্ভরযোগ্য, হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যবাদী আলেমদের থেকে পরামর্শ নেওয়া। যেন উম্মাহকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন,বিভ্রান্তির গোলকধাঁধা থেকে স্পষ্ট সত্যের আলোতে নিয়ে আসতে পারেন।

উপরন্তু তাকেএরূপ দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে,যার দ্বারা তিনি তার বিরুদ্ধাবাদী বাতিলপন্থিদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে পারেন। এমনিভাবে তার কর্তব্য হবে,প্রজা / মা'মুরদেরকে (অধীনস্ত) ইলম অর্জনে উৎসাহিত করা,এর জন্য অনেক ইলমী মারকায ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা.. .. ..ইত্যাদি।

আর শাসক নিজেই তালিবুল ইলমদের ব্যয়ভার বহন করা,তাদের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ভাতা ধার্য করা,যা তাদেরকে প্রাত্যহিক জীবনে সহযোগীতা করবে,আলেমদেরকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা,তা'লীমে নিয়োজিতদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা,বহির্দেশ থেকে আলেমদেরকে আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি তার অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। যেন এর মাধ্যমে ইলম প্রসার লাভ করে এবং মুসলিম শহরগুলো ইলমের সৌরভে সুরভিত হয়,উন্নতি লাভ করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ও তার রাসূল সা: মুসলিমদেরকে ইলম অন্বেষণ করতে ও আলেমদের অনুসরণ করতে উদ্ধুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"মুসলিমদের পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তারা (সর্বদা) সকলে এক সঙ্গে (জিহাদে) বের হয়ে যাবে। একটি অংশ কেন (জিহাদে) বের হয় না,যাতে (যারা জিহাদে যায়নি) তারা দ্বীনের উপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করে এবং সতর্ক করে তাদের কওম (-এর সেই সবলোক)কে, যারা জিহাদে গিয়েছে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে,ফলে তারা (গুনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে।" াওবা:১২২)

আবুদ্দারদা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল সা: কে বলতে শুনেছি,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقا يَبتَغي فيه عِلما سَهل اللّهُ له طَرِيقا إلى الجَنّة وإنّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أجنِحَتَها لِطالِبِ العِلمِ وإنّ العالِمَ لَيَستَغفِر لَهُ مَن في السَماواتِ وَمَن في الأرضِ حَتّى الحيتانُ في الماء. وَفَضلُ العالِمِ على العابِدِ كَفَضلِ القَمَر على سائر الكواكِبِ، إنّ العُلماءَ وَرَثَةُ الأنبياء، إنّ الأنبياءَ لَم يُورّثوا دينارا ولا دِرهَما، إنّما ورّثوا العِلمَ فَمَن أخَذَ بِهِ أخَذَ بِحَظّ و افِر

"যে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চলে,আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য তাদের ডানাসমূহ

বিছিয়ে দেন। আলিমের জন্য আকাশ ও যমীনের অধিবাসীরা-এমনকি সমুদ্রের মাছও- ক্ষমা প্রার্থনা করে। আবিদের উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হল, তারকারাজীর উপর চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়। নিশ্চয়ই নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না; বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকারী বানান। তাই যে এটা গ্রহণ করল, সে ই পূর্ণ অংশ গ্রহণ করল"। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী)

মুআবিয়া রা: বর্ণনা করেছেন, নবী সা: বলেন: : " **من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين**". "আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণ চান,তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন"।

(বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ: বলেন: "

এটা প্রমাণ করে,যাকে তিনি দ্বীনের ফিকহ বা বুঝ দান করেননি,তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেননি। আর যাকে দ্বীনের বুঝ দান করেছেন, তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। তবে তখন ফিকহ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এমন ইলম,যার অনিবার্য ফল হচ্ছে আমল। কিন্তু যদি তার দ্বারা নিছক ইলম উদ্দেশ্য হয়,তখন এটা একথা প্রমাণ করবে না যে,যে দ্বীনি বুঝ অর্জন করেছে,তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করা হয়েছে। কারণ তখন কল্যাণের ইচ্ছা করার জন্য দ্বীনি বুঝ থাকা হবে শর্ত। আর প্রথমোক্ত অবস্থায় তা হবে ফল। আল্লাহ ই ভাল জানেন"।

ইবনে বাত্তাল রহ: বলেন:

"এর মধ্যে সকল মানুষের উপর আলেমদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার এবং অন্য সকল ইলমের উপর দ্বীনি ফিকহ শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর এর শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হল, যেহেতু এটা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে,তার আনুগত্যে অটল থাকতে ও তার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। তাই ইলমের দ্বারাই সমস্ত ইবাদত বিশুদ্ধ ও উপযুক্ত হয়,আর তা না হলে প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ত্রুটি হতে থাকে। এমনকি কখনো তা গুনায় পরিণত হয়। ইলমের দ্বারা জাতি উন্নতি লাভ করে আর ইলম ছাড়া পতিত হয়। আর উম্মাহর নেতৃবৃন্দই উক্ত ইলমের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী। রাসূল সা: এক হাদিসে এমনটিই বর্ণনা করেছেন,যা বর্ণনা করেছেন হযরত আবুদ্দারদা রা:,রাসূলুল্লাহ বলেছেন: **"নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। আর নিশ্চয়ই নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানিয়ে**

যান না। বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকারী বানান। তাই যে তা গ্রহণ করল,সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করল।"

ইলম অর্জন শুধু শরয়ী ইলম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা যেকোন কারিগরি,প্রযুক্তিগত, সামরিক ও অন্যান্য ইলমকেও অন্তর্ভূক্ত করে। আনাস ইবনে মালেক রা: থেকে বর্ণিত, নবী সা: বলেন: "ইলম অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ"। বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকি রহ। ইমাম আল-বানী তার 'সহীহুল জামে' কিতাবে এর বিশুদ্ধতা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বাইহাকী রহ: বলেন: "উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন ইলম,যা কোন সুস্থ মস্তিস্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির অজানা থাকার অবকাশ নেই। অথবা এমন জিনিসের ইলম,যা শুধু তার সামনে উপস্থিত হয়। সে এটা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে জেনে নিবে। অথবা উদ্দেশ্য হচ্ছে,যতক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ লোক এই দায়িত্ব পালন না করে,ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইলম ও আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা: এর নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল: তাদের একজন আবিদ (শুধু ইবাদতকারী), অপরজন (ইবাদতকারী) আলিম। তখন রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, আবিদের উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হল তোমাদের সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোকের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্বের মত। অত:পর রাসূল সা: বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও যমীনবাসীগণ-এমনকি গর্তের পিপিলিকা ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত- ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়।"

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ: বলেন: যেহেতু তার প্রদত্ত শিক্ষাটিই তাদের মুক্তি, সৌভাগ্য ও আত্মশুদ্ধির কারণ হবে, একারণে আল্লাহ তা'আলা তাকেও অনুরূপ আমলের সাওয়াব দিবেন। আর তা এভাবে যে- তিনি তার সালাত, ফেরেশতাদের সালাত ও যমীনবাসীদের সালাত থেকে একটি অংশ তার জন্য নির্ধারণ করবেন, যা তার মুক্তি, সৌভাগ্য ও সফলতার কারণ হবে। কারণ যেমনিভাবে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দাতা আল্লাহর দ্বীন ও তার বিধি-বিধানকে প্রকাশকারী এবং মানুষের নিকট আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর পরিচয় দানকারী, অনুরূপ আল্লাহ তা'আলাও নিজের সালাত, আসমানবাসীদের সালাত ও যমীনবাসীদের সালাত তার জন্য নিয়োজিত

করবেন, যার ফলে আসমান ও যমীনবাসীদের মাঝে তার প্রশংসা, সম্মান ও স্তুতি গাওয়া হবে।

ইমাম বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ রহ: বলেন: জেনে রাখুন! ঐ ব্যক্তির মর্যাদার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা কিছু হতে পারে না, যার জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য মাখলুকগণ নিয়োজিত হন এবং তার জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।

একজন নেককার ব্যক্তি বা যার ব্যাপারে সালিহ হওয়ার ধারণা করা হয়,তার থেকে দু'আ নেওয়ার ব্যাপারেই মানুষ প্রতিযোগীতা করে,তাহলে ফেরেশতাদের দু'আর বিষয়টি কত মর্যাদাপূর্ণ!

ফেরেশতাদের ডানা বিছানোর অর্থ কি.. এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ হল,তার জন্য বিনয়ী হওয়া। কেউ বলেছেন,তার নিকট আসা ও তার সাথে উপস্থিত হওয়া। কেউ বলেছেন,তাকে সম্মান করা। কেউ বলেছেন,এর অর্থ হল,ফেরেশতাগণ তাকে ডানার উপর বহন করে,অত:পর তাকে গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। আর পশুপাখিকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বুঝ দেওয়ার কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলেছেন: প্রথমত: যেহেতু এগুলোকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধার জন্য। উপরন্তু আলেমগণই এগুলোর মধ্যে কোনটি হালাল,কোনটি হারাম,তা বর্ণনা করেন এবং এদের প্রতি দয়া করার ও এদের ক্ষতি না করার উপদেশ দেন।

.....ইনশাআল্লাহ চলবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬২৩৩

সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার ভয়াবহতা

Abdullah Bangladeshi

Junior Member

০৫-০৪-২০১৭

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই। সালাম এবং রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।

অত:পর,

নি:সন্দেহে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিয়ামাত গুণে শেষ করতে পারবো না, যার অগণিত নিয়ামাত আমাদের ঘিরে রয়েছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামাত হচ্ছে, যাকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা ঈমান দিয়েছেন এবং তাকে সে অনুযায়ী চলার তৌফিক্ব দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাতকে জিহাদ ফি সাবী লিল্লাহ দিয়ে সম্মানীত করেছেন, যদি আমরা উপলব্ধি করি। আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ মু'মিনদের হাতে কাফিরদের শাস্তি দিতে পছন্দ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীদের সর্বাত্তক জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার শারী'আহ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, তারা এত বড় কোরবানী করেছেন বলেই আমরা আজ উঁচু গলায় ইসলামের ডাক দিতে পারছি আল্লাহর অনুমতিক্রমে। একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ ইসলামের দুশমনদের গোড়া কর্তণ করেছেন।

যাইহোক, আল্লাহর অশেষ রহমতে দুনিয়ার অনেক জায়গায় আবার জিহাদ বুলন্দ হচ্ছে। এবং নিঃসন্দেহে সম-সাময়িক আলিমদের ঐক্যমতে আজ সারা দুনিয়ায় যেখানে জিহাদের ফ্রন্ট (ময়দান) উম্মোচিত হয়েছে বা হয়নি, সে সব জায়গায় জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারদুল আ'ইন হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে। সে হিসেবে, আল্লাহ কুর'আনে যাদেরকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তারা

ব্যতীত সকল মুসলিমের উপর জান এবং মাল দিয়ে তাগুত ও মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফারদুল আ'ইন। যেমন আল্লাহ কুর'আনে বলেনঃ

"আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলে ছিল। এবার তাদের উপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফির। দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ্য লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের পথ নেই। আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু।'' [সূরা আৎ-তাওবা (৯):৯০-৯১]

যে পরিস্থিতিতে মুরতাদ শাসকগণ আজ সারা দুনিয়ায় আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শারী'আহ পরিবর্তন করে নিজের হাতে বানানো আইন দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে শাসন করছে এবং তাদেরকে এই কুফর আইনের উপর চলতে বাধ্য করছে, এমতাবস্থায় কোন মু'মিনের জন্য ঘরে বসে থাকা শোভনীয় নয়, যদি আমরা আসলেই আল্লাহ এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসি। কারণ এমতাবস্থায় কোন শারী'আহ সঙ্গত ওযর ছাড়া জিহাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ঘরে বসে থাকা নিফাক্বের পরিচয় হিসাবে কুর'আনে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন:

''আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের সাথে একাত্ম হয়ে; তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। তারা পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া (সমস্ত রকম ভাল এবং সঠিক হিদায়াত থেকে) হয়েছে তাদের অন্তর সমূহের উপর। বস্তুত তারা বোঝে না।'' [সূরা আৎ-তাওবা (৯): ৮৬-৮৭]

আমাদের মুজাহিদ শাইখ্ আনোয়ার আওলাক্বী (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) তার মাশ'আরী আল আশওয়াক নামক সিরিজ লেকচারে এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন:

''(যার সারমর্ম হচ্ছে) এই সমস্ত মুনাফিক্ব যারা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সলাত আদায় করেছে, তারঁ সাথে উঠা বসা করেছে, তাঁর মুখ থেকে সরাসরি ক্বুরআন এবং হাদীছ শুনেছে, জ্ঞানী সাহাবীদের সাথে সময় অতিবাহিত করেছে যার ফলে তারা আমাদের থেকে শারী'আর ব্যাপারে বেশী জ্ঞানী ছিল কিন্তু তারপর যখন তারা তাবুক অভিযানে রসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে না গিয়ে ঘরে বসে থাকবেন বেশী আনন্দিত ছিল, যার কারণে আল্লাহ তাদের ক্বালবে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এত জ্ঞানী হওয়া সত্বেও আল্লাহ বলেছেন তারা দ্বীন বোঝে না।''

তাই প্রত্যেক মু'মিনের উচিত জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর সামনে নিজের ঈমানের সত্যবাদিতা প্রমাণ করা। এবং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী। কোন কোন সময় আল্লাহ মু'মিনদের জীবনে তাকে আ'মলে সালিহ করার সুযোগ দেন; যে এই সুযোগের মর্যাদা বুঝে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাথেয় বানায় সেই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান। এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার কারণে আল্লাহ তাকে একের পর এক আমলে সালিহ করার তৌফিক্ব দান করেন। নি:সন্দেহে ভাল আ'মল আল্লাহর তৌফিক্বক্রমে সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে এই আ'মলে সালিহ করার সুযোগকে যারা মর্যাদা দেয় না এবং একে কাজে লাগায় না, হয়ত তারা পরবর্তীতে আফসোস করবে, এমনও হতে পারে এই সুযোগ তার জীবনে আর দ্বিতীয় বার আসবে না। তাই প্রত্যেক মু'মিনের উচিত যখন জিহাদের ডাক আসে, আর তখন সে সব দিক দিয়ে স্বশরীরে জিহাদ করতে সক্ষম অথবা মাল দিয়ে অথবা জিহাদের অন্যান্য কাজে সহযোগীতা করতে সক্ষম: প্রথম অবস্থাতেই তার ডাকে সাড়া দেওয়া। অন্যথায় আল্লাহ তাকে পরবর্তীতে আর জিহাদ করার তৌফিক্ব নাও দিতে পারেন।

যেমন আল্লাহ ক্বুর'আনে বলেন:

''বস্তুত: আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অত:পর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে

থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক।''[সূরা আৎ-তাওবা(৯):৮৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছীর (রহীমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে বলেন:

(অধ্যায়) মুনাফিক্বদের জিহাদে যাওয়া থেকে বাঁধা দেয়া হয়েছে: আল্লাহ তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নির্দেশ দেন: (বস্তুত: আল্লাহ যদি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এই অভিযান (তাবুক) থেকে (কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে) ক্বাতাদার মত অনুযায়ী এখানে (মদীনার) বার জন (মুনাফিক্ব) কে ইঙ্গিত করা হয়েছে,(এবং অত:পর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে) আপনার [রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] সাথে অন্য যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, (তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না) এটা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের জন্য ধমক এবং শাস্তিস্বরুপ। আল্লাহ এই (শাস্তির) সিদ্বান্তের পিছনে বলেন: (তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ)

এরকম অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

''আর আমরাও তাদের অন্ত:করণ ও তাদের দৃষ্টি পাল্টে দেব যেমন তারা প্রথমবার এতে ঈমান আনে নি; আর তাদের ছেড়ে দেবো তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে।'' [সূরা আন'আম(৬):১১০]

একটি মন্দ কর্মের শাস্তি স্বরুপ কাউকে অন্য একটি মন্দ কর্মের দিকে ধাবিত করা হয়। একই ভাবে একটি আমলে সালিহের পুরস্কার স্বরুপ তাকে অন্য একটি আ'মলে সালিহের প্রতি ধাবিত করা হয় ..... আল্লাহ পরবর্তিতে বলেনঃ

(কাজেই পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক) ইবনে আববাস (রদিআল্লাহু আনহু) এর মত অনুযায়ী এখানে ঐসব লোকদের ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা (তাবুক) অভিযানে না গিয়ে ঘরে বসে ছিল। Tafsir Ibn Kathir (abridged), Darussalam Vol :৪

আমাদের প্রিয় মুজাহিদ শাইখ আনোয়ার আওলাক্বী তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী: মদীনা পার্ট-২ লেকচার সিরিজে কা'ব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) এর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

সাথে তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহন না করার পিছনে বুখারী শরীফে যে বিখ্যাত হাদীছ স্বয়ং ব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন তার উপর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষন করেছেন এবং বলেছেনঃ

''ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহীমাহুল্লাহ) এই হাদীছ থেকে আমাদের জন্য কিছু শিক্ষনীয় বিষয় বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছেঃ আল্লাহ যখন কারো জন্য কোন আমলে সালিহ করার সুযোগ খুলে দেন তখন তার উচিত দেরী না করে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। প্রিয় ভাই বোনেরা কোন কোন সময় আল্লাহ আপনাদের জীবনে আমলে সালিহ করার সুযোগ খুলে দেন। এই সুযোগ আসে আবার চলে যায়। কিছু সময় এই সুযোগ ভাল কিছু নিয়ে চলে যায়। যদি আপনারা এই সুযোগের সদ্বব্যবহার না করেন, তাহলে হতে পারে আপনারা সারা জীবনের জন্য এটা হারাবেন।

কা'ব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) এর জন্য তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহণের সুযোগ খোলা হয়েছিল কিন্তু তিনি তা হারিয়েছেন। এর মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে যেটা তিনি (কা'ব) স্বয়ং বলেছেনঃ ''হায় আফসোস! আমি মনে করেছি আমি (তাবুক অভিযানের) সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারব''। তাই জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে পিছনে থাকবেন না, এই ভেবে যে আমি তো যেতেই পারব। তাই আল্লাহ আপনার জন্য যে সুযোগ খুলে দিয়েছেন তার সদ্ধব্যবহার করুন এবং কোন কোন সময় এই সুযোগের সদ্বব্যবহার না করার পরিণতি অনেক ভয়াবহ হতে পারে, যেমন আল্লাহ বলেন:

''ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রসূলের প্রতি সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের আহবান করেন তাতে যা তোমাদের জীবন দান করে। আর জানো যে আল্লাহ মানুষের ও তার অন্ত:করণের মাঝখানে বিরাজ করছেন; আর নি:সন্দেহ তিনি – তাঁরই কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।''[সূরা আনফাল(৬): ২৪]

আল্লাহ আপনাকে পরবর্তীতে (জিহাদে) অংশগ্রহণ করার তৌফিক্ব না দিয়ে আপনার এবং আপনার ক্বলব্বের মাঝে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারেন। তাই যে সুযোগ আপনার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে তার সদ্বব্যবহার করুন এবং (জিহাদ থেকে) পিছনে থাকবেন না।

আল্লাহ সূরা আনআ'মে বলেন:

''আর আমরাও তাদের অন্ত:করণ ও তাদের দৃষ্টি পাল্টে দেব যেমন তারা প্রথমবার এতে ঈমান আনে নি; আর তাদের ছেড়ে দেবো তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে।''[সূরা আন'আম(৬):১১০]

তারা প্রথমবারে (ঈমান আনতে) প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই আল্লাহ তাদের ক্বলব্ এবং চোখ উল্টিয়ে দিয়েছেন, তাই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা অন্য আয়াতে বলেন:

''আল্লাহ এরূপ নন যে, কোন জাতিকে হিদায়াত করার পর পথভ্রষ্ট করে দেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সেসব বিষয় পরিস্কারভাবে বলে দেন, যা হতে তারা বেঁচে থাকবে; নি:সন্দেহে আল্লাহ সব- কিছুতে সর্বজ্ঞাতা।''[সূরা আৎ-তাওবা(৯):১১৫]
আল্লাহ তাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন তাদের কি পরিত্যাগ করা উচিত। আল্লাহ তাদের সৎ আমল করার সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আল্লাহ (হিদায়াতের পর) তাদের পথভ্রষ্ট করেছেন।

(ইবনুল ক্বাইয়্যিম থেকে বর্ণিত) পরবর্তী শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে: তাবুক অভিযান থেকে শুধুমাত্র তারাই রয়ে গিয়েছিল যারা মুনাফিক্ব, জিহাদ করতে অসমর্থ (অসুস্থ, পঙ্গু ইত্যাদি) এবং যাদেরকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় থাকার জন্য নিয়োগ করেছেন। তাই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ না করা নিফাক্বের পরিচয় হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে।''

(শাইখ আনোয়ার আওলাক্বীর বক্তব্য শেষ)

আল্লাহর কাছে শুকরিয়া এজন্য যে, কা'ব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) এর তাবুকে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা, এজন্য তাকে কত বড় খেসারত দিতে হয়েছে এবং এ ঘটনার উপর কুর'আনের আয়াতও [সূরা আৎ-তাওবা(৯):১১৬-১১৭] আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা কি জানি, কা'ব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) কত বড় সাহাবী ছিলেন? তিনি হচ্ছেন একজন বড় আলিম সাহাবী, যিনি বদর ছাড়া সব যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন, এমনকি বাইয়াতে আ'কাবায়ও। যে বাইয়াতকে সাহাবীরা বদর যুদ্ধ থেকেও বেশী ফযীলতপূর্ণ মনে করতেন। তাও বদর যুদ্ধে

অংশগ্রহণ না করার পিছনে তার সঙ্গত কারণ ছিল। তাই কা'ব ইবনে মালিকের যদি শুধু একটি অভিযানে অংশগ্রহণ না করার জন্য এত বড় খেসারত দিতে হয়েছে, যার বর্ণনা কা'ব (রদিআল্লাহু আনহু) স্বয়ং দিয়েছেন এবং ক্বুর'আনেও বর্ণিত হয়েছে; তাহলে আমাদের অবস্থা কি, যারা এখনও জিহাদ থেকে পিছনে রয়েছি, এমন কি জিহাদে কোন অংশগ্রহণও নেই; কোন শারী'য়াহ সঙ্গত ওযর ছাড়া। কিসের উপর ভিত্তি করে আমরা নিশ্চিন্ত বসে আছি?

আর একটি বিষয় হচ্ছে, তখন তো কা'ব ইবনে মালিকের তওবা কবুল করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার কারণে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, আল্লাহ কা'ব (রদিআল্লাহু আনহু) এর তওবা কবুল করেছেন। এমন কি সত্য কথা বলতে কি; এ ঘটনার পর কা'ব (রদিআল্লাহু আনহু) এর মর্যাদা সাহাবীদের মাঝে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের কারও অবস্থার উপর এখন তো আর অহী অবতীর্ণ হবে না, তাই কেউ যদি আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেক দূরে সরেও যায়, তাহলে কিভাবে বুঝবো? তাই ক্বা'বের এই ঘটনার পর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ যে শিক্ষা নিয়েছেন এবং সতর্ক হয়েছেন, তার থেকেও বেশী সতর্ক আমাদের হওয়া উচিত, যেন আমরা এত বড় বিপর্যয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পরি। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন। কারণ কা'বের এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী এবং বর্তমান যুগের আলিমদের অনেক কিতাব এবং আলোচনা রয়েছে। প্রবন্ধ ছোট না করার ইচ্ছা থাকলে, আমি সেখান থেকে কিছু এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করতাম। বিশেষ করে শাইখ ওসামা বিন লাদেনের লিখিত কিতান ''দারসে হাদীছে ক্বা'ব (রদিআল্লাহু আনহু) ''।

তাই আমি ভাই-বোনদের বলব, বুখারী শরীফ (Vol.৫, Book ৫৯, Hadith ৭০২, Riyad-us- Saliheen Hadith:২১) থেকে স্বয়ং ক্বা'ব ইবনে মালিকের জবানী থেকে এই হাদীছ পড়তে নয়, বরং পর্যবেক্ষণ করে নিজ নিজ অবস্থার হিসাব নিতে, আল্লাহই একমাত্র তাউফীক্ব দাতা।

তাই আমি বলছি, আমরা যদি, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিহাদ থেকে কাউকে অব্যাহতি দেন নি, না আলিম সাহাবীদেরকে, না

ধনী সাহাবীদেরকে, না গরীব সাহাবীদেরকে, না তখনকার গোত্রপতী সাহাবীদেরকে, না তখনকার রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী সাহাবীদেরকে; আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তবে যদি জিহাদের বা জামা'আতের আমির কাউকে কোন বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেন, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রদিআল্লাহু আনহু) কে তাবুক অভিযানের সময় মদীনায় নিয়োগ করেছেন, এটা আলী (রদিআল্লাহু আনহু) এর কোন ব্যক্তিগত অভিমত ছিল না, তিনি তাবুক অভিযানে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যাওয়ার জন্য আকুল ছিলেন।

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেকে আমিরের সামনে পেশ করা, জিহাদের আমির তার অবস্থা বুঝে তাকে তার উপযুক্ত জায়গায় কাজ করার জন্য নিয়োগ করবেন। যেমন খুরাসানের বর্তমান মুজাহিদদের আমির আবু আবদুল্লাহ আতিয়া আল্লাহ আল-লিবিব (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) একটি লিখিত প্রবন্ধে বলেন:

''সেজন্য এখন আমাদের জন্য জিহাদ ফারদুল আ'ইন বলতে আমরা যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হল: প্রত্যেক মুসলিম তার সামর্থ অনুযায়ী এবং যেটা তার জন্য উপযুক্ত ও যেটা তাকে করতে বলা হয়েছে, সেভাবে (জিহাদের) কাজ করবে। এবং অবশেষে শাইখ্ আবদুল্লাহ আয্যাম (রহীমাহুল্লাহ) এর ''Join The Caravan'' কিতাব থেকে নকল করে যেটা আমি বার বার বলেছি যে, যে তার জান এবং প্রস্ত্ততি কোরবানী করে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের কাফিলায় যোগ দিয়েছে এবং তার কথাকে আমলে পরিণত করেছে এই বলে যে:

''এখানে আমি মুসলিমদের একজন তীর (অর্থাৎ মুসলিম আর্মিদের সাথে জিহাদ করতে প্রস্ত্তত) হিসাবে হাজির আছি, তাই মুসলিমদের আমির আমাকে যেখানে ইচ্ছা (জিহাদের) কাজে লাগাক।''

তাই আমি উদাহরণ স্বরূপ বলছি; ওমুক এবং ওমুক চেচ্নিয়ায় জান, কারণ সেখানে ওমুকের প্রয়োজন এবং তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব। এবং ওমুক -ওমুক (জিহাদের) ওমুক জায়গায় যান এবং ওমুক আপনার নিজ জায়গায় অবস্থান করে (জিহাদের জন্য) মাল (অর্থ) সংগ্রহ করুন, ব্যবসা করুন, (দ্বীনের জন্য) লিখুন, বলুন,

দাওয়া দিন, মিডিয়ার কাজ করুন অথবা জ্ঞান অর্জন করতে থাকুন এবং ওমুক ও ওমুক ওমুক -ওমুক কাজ করুন। তাই বুঝা গেল যার জন্য জিহাদের আমিরের সাথে যোগাযোগ সম্ভব, যাতে করা তারা (জিহাদের আমিরগণ) জানতে পারেন তার জন্য (দ্বীনের) কোন কাজ উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয়, এগুলো সবই সম্পাদিত হবে ঈমানের সাথে, সত্যবাদীতার সাথে, ইখলাছের সাথে।

যারা এটা করতে সক্ষম নয়; যাদের সংখ্যাই বেশী তাদের সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগানো উচিৎ এবং যতটুকু সম্ভব (আল্লাহর রাস্তায়) চেষ্টা-সাধনা করা উচিৎ। এগুলোর জন্য আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ তাক্বওয়া জরুরী। প্রয়োজনে জিহাদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং সালিহ্ লোকদের সাথে পরামর্শ করুন। আল্লাহ তাদের হিদায়াত এবং সফলতা দান করুন।

ইনশা'আল্লাহ এভাবে তারা তাদের (জিহাদের) দায়িত্বের প্রতি সম্মান দেখাতে পারবে এবং নিজেদের (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করতে পারবে। আল্লাহর কাছে শুধু তাক্বওয়াই গ্রহণযোগ্য। সেজন্য সত্য কথা বলতে কি; এই সময়ে জিহাদ করার জন্য পিতা-মাতার কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জ্ঞানী এবং নেই কোন শক্তি, নেই কোন ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া।'' (আবু আবদুল্লাহ আতিয়া আল্লাহ আল-লিবিবর বক্তব্য শেষ)

তাই কেউ যদি জিহাদের জন্য শুধু মাল খরচ করে, এটা তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহনযোগ্য যতক্ষণ সে জান দিয়ে জিহাদ না করতে পারে; কোন শারী'য়াহ সঙ্গত ওযরের কারণে, অনুরুপভাবে যারা জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে তাদেরও মাল খরচ করতে হবে সামর্থ অনুযায়ী। আর কেউ শারী'য়াহ সঙ্গত ওযরের কারণে যদি জান এবং মাল কোন টাই দিতে না পারে, তাহলে তার উচিত জিহাদ এবং দাওয়ার কাজে সার্বিক সহযোগীতার চেষ্টা করা। (এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে কেউ আনোয়ার আল আওলাকীর মাশ'আরী আল আশওয়াক সিরিজ লেকচার শুনতে পারেন এবং তারই লিখা কিতাব '' 88 Ways to Serve & Parcipate in Jihaad'' পড়তে পারেন) আর প্রকৃত পক্ষে সব কিছুই নির্ভর করে নিয়্যত এবং ইখলাছের উপর। কেউ যদি শারী'য়াহ সঙ্গত ওযরের কারণে জিহাদ না করতে পারেন, তাহলে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট

এবং ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তার জন্য রাস্তা খুলে দিবেন। এর জন্য তাক্বওয়া, সবর, তাওয়াক্কুল এবং ইস্তিক্বামাত একান্ত জরুরী।

কারণ এগুলো এজন্যই বলছি যে, সম্প্রতি জিহাদের হুকুমের ব্যাপারে অনেকের মধ্যে কিছু অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা গেছে। এবং হয়ত এ ব্যাপারে আমাদের কিছু অবহেলাও রয়েছে। একটি বিষয় সকলের ক্বলবে গাঁথা উচিত যে, আল্লাহ হচ্ছেন আস-সামাদ, তিনি কোন কজেই আমাদের উপর মুখাপেক্ষী নন, যেটা আল্লাহ ক্বুর'আনে স্পষ্টভাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘোষণা করেছেন, বরং সব সময়, সব কাজে আমরাই তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী। তাই কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় জান এবং মাল দেয়, এটা তার নিজের জন্যই, এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কোন মুখাপেক্ষীতা বা প্রয়োজন নেই। তিনি হচ্ছেন আশ-শাকুর; যিনি বান্দাকে আমলে সালিহ করার তৌফীক্ব দান করেন এবং তিনি অতি অল্প আমলের জন্য কাউকে জান্নাতে অতি উচ্চ অবস্থান দান করেন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, নতুবা আমাদের সকল প্রচেষ্টা তো অতি সামান্যই, যদি আমরা আল্লাহর রাস্তার নিহতও হই।

আর যদি কেউ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদেরকে পরিবর্তন করে অন্য কাউকে নিয়ে আসতে সক্ষম। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

''হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায়, তবে (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই।) কেননা আল্লাহ সত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন বস্তুত: আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, মহাজ্ঞানী। ''[সূরা মা'য়িদা(৫): ৫৪]

তাই আমি বিশেষ করে ঐ সমস্ত ভাই এবং বোনদের বলব; যাদেরকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করে; তাদের সামর্থ অনুযায়ী। যদি তারা আল্লাহ রাস্তায় জান দিয়ে জিহাদ না করতে পারে বা করেও। কেননা জিহাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশী মালের প্রয়োজন হয়। কেননা মুজাহিদদের

সামনে এমনও অনেক সময় এসেছে যে, তারা অর্থের অভাবে কাফিরদের উপর হামলা করতে পারেনি এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অভাবে অনেক অসমর্থতাও সামনে এসেছে। যেমন খুরাসানের বর্তমান মুজাহিদদের আমির আবু আবদুল্লাহ আতিয়া আল্লাহ আল-লিবিব (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) তার একই প্রবন্ধে বর্তমানে খুরাসানে জিহাদ পরিচালনার ব্যাপারে কিছু সমস্যা আলোচনা করার পর বলেছেন:

''যেটা উম্মাহর ধনী ব্যক্তিদের বড় অংকের আর্থিক সহযোগীতা না করার কারণে সংঘটিত হয়েছে এবং তাদেরও অবহেলা এর সাথে জড়িত, যাদের দক্ষতার সাথে উম্মাহ পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে এবং যাদের কোন বিশেষ কাজে দক্ষতা রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তাদের বিশেষ দক্ষতার কারণে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করেছেন।

তাই আমাদেরকে মাল এবং দক্ষ ব্যক্তি দিয়ে সাহায্য করুন এবং আপনারা দেখতে পাবেন কত জিহাদের ফ্রন্ট (ময়দান) এবং ট্রেনিং ক্যাম্প আমরা খুলি এবং আল্লাহর সাহায্যে তাঁর শত্রুদের কি অবস্থা করি। শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই আমরা সাহায্য চাই। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের জন্য উত্তম জিম্মাদার।''

আর এজন্যই ক্বুর'আনের প্রায় সব জায়গায় যেখানে জান দিয়ে জিহাদের কথা এসেছে সেখানে মালের কথাও এসেছে। এর প্রয়োজনীয়তা আমার মত অক্ষম মুসলিমের আর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এবং যেসব মালদার ভাই-বোনদের এখন সুযোগ রয়েছে কোন মুজাহিদ পরিবারকে সাহায্য করা বা কোন মুজাহিদ বন্দীকে সাহায্য করা বা তার পরিবারকে সাহায্য করা বা যেসব বোনদের স্বামী আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে তাদের সাহায্য করা, আপনারা কি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদীছ শুনেছেন?

''যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে না, অথবা কোন মুজাহিদকে (জিহাদের সরঞ্জামাদি বা অর্থ দিয়ে) তৈরি করে না, অথবা কোন মুজাহিদের রেখে যাওয়া পরিবারের খোঁজ খবর রাখে না (বা দেখাশোনা করে না), আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের আগে অকস্মাত আযাব দিয়ে শাস্তি দিবেন''।[সহীহ আবূ দাউদ]

শাইখ্ আবু বাসীর (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) এই হাদীছের ব্যাপারে বলেন:

''তাই কোন মু'মিনের জন্য উল্লেখিত তিন শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীতে শামিল হওয়া উচিত নয়: হয় সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, অথবা কোন মুজাহিদের রেখে যাওয়া পরিবারের খোঁজ খবর রাখবে (বা দেখাশোনা করবে) অথবা কোন মুজাহিদকে আল্লাহর রাস্তায় তৈরি করবে; অন্যথায় সে তার উপর ক্বিয়ামাতের পূর্বেই(আল্লাহর) আযাব আসার অপেক্ষা করুক; আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এই আযাবের বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতি কিরূপ হবে।''

কারণ এখানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ বা কোন মুজাহিদ পরিবারকে সাহায্য করাই মুখ্য বিষয় নয়, বরং এর সাথে এক পুরা মজবুত জিহাদ প্রক্রিয়া জড়িত। একজন মুজাহিদ যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে যায়; সে যখন দেখে যে, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহতও হই, তাহলে পিছনে আমার সেইসব আন্তরিক প্রিয় ভাই-বোনেরা রয়েছে, যারা আমার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারকে শুধু আর্থিক সহযোগীতা বা দেখা শোনাই নয়, বরং তাকওয়া, সবর এবং ইস্তিক্বামাতের সবকও শিখাবে। এমনকি প্রয়োজনে শহীদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আল্লাহর দিকে দাওয়াহও দেয়ার চেষ্টা করবে। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে একজন মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় আন্তরিক ভাবে তার জান কোরবান করতে দ্বিধাবোধ করবে। আমরা কি এটা ভেবে দেখেছি!

আমাদের মুজাহিদ শাইখ আনোয়ার আল আওলাক্বী (আল্লাহ তাকে হিফাযাত করুন) তার এক লেকচারে আফসোস করে বলেছেনঃ

''ইয়ামানের এক ভাই আমাকে বলেছেন, কোন এক জন বোনের স্বামী জিহাদে শহীদ হওয়ার পর, সেই বোন আর্থিক অভাবের সম্মুখীন হন, এমনকি সেই বোন ঈদের দিন মানুষের কাছে তার বাচ্চাদের ঈদের জন্য পুরানা জামা-কাপড় তালাশ করছে। ''

আল্লাহু আকবার! হায় আফসোস আমাদের, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সামনে কি জবাব দেব? আমাদের কি অশ্রুসিক্ত হচ্ছে না! রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী এবং এইসব ভাইদের রক্তের বিনিময়েই তো আজ আমাদের কাছে ইসলাম এসেছে।

কেননা পূর্বেই বলেছি, আল্লাহ আপনাকে আজ আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার সুযোগ দিয়েছেন, হয়ত এই সুযোগ সব সময় থাকবে না, হয়ত আর আসবেও না।

কেননা কত সময় আছে যে, আমরা আল্লাহর কাছে দো'আ করিঃ হে আল্লাহ আমাকে আপনার রাস্তায় জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ করার তৌফিক্ব দ্বান করুন; আর যখন আল্লাহ আমাদের দো'আ ক্ববুল করেন এবং আর আমাদের সামনে এর সুযোগ খুলে দেন, তখন যদি আমরা দ্রুততা এবং আন্তরিকতার সাথে সাড়া না দেই; তখন কি আমাদের সূরা তাওবার এই আয়াত জানা নেই!

''আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই খুব দান-খয়রাত করবো এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো। কার্যত: যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং (আনুগত্য করা হতে) তারা গোঁড়ামীর সাথেই বিমুখতা অবলম্বন করলো। সুতরাং আল্লাহ তাদের শাস্তি স্বরুপ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক্ব ঢেলে দিলেন, যা আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকবে, এই কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের ওয়াদার খিলাফ করেছে, আর এই কারণে যে, তারা (পূর্ব হতেই) মিথ্যা বলছিল।''[সূরা আৎ-তাওবা(৯): ৭৫-৭৭]

এখন সময় এসেছে কথাকে আ'মলে পরিণত করার. . . . . .
আমি আল্লাহর কাছে দো'আ করি, তিনি যেন আমাদের ভাই-বোনদের সিরাতুল মুস্তাক্বিমের উপর দৃঢ় রাখেন, আমাদেরকে নাবী, সিদ্দীক্ব, সালিহীন এবং শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬০৫

নব্য মুরজিয়া!

abu_mujahid

Senior Member

০৫-০৪-২০১৭

শায়খ বকর আবু জায়েদ রহঃ এবং শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ

পূর্বের ও এখনকার সময়ের মুরজিয়াদের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহঃ

মুরজিয়ারা তিন ধরনেরঃ

১. যারা ঈমান ও ক্বদরের ব্যাপারে ক্বাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলাহদের মত ইরজা পোষন করে,

২. যারা জাহমিয়্যাহদের মত ঈমানে ইরজা ও আমলে জবর পোষন করে (যেমনঃ মানুষের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই, তাকে তার কৃতকর্ম করতে বাধ্য করা হয়)

৩. তৃতীয় শ্রেনী জাবারিয়্যাহ ও ক্বাদারিয়্যাহদের থেকে ভিন্নতর। এদের বহু শ্রেনীবিভাগ রয়েছেঃ ইউনিসিয়্যাহ, গাসসানিয়্যাহ, সাওবানিয়্যাহ, তুমনিয়্যাহ এবং মুরিসিয়্যাহ ইত্যাদি।

মুরজিয়াদেরকে মুরজিয়া বলা হয় কারণ তারা আমলকে ঈমানের পেছনে ফেলে দেয়। ইরজা শব্দের অর্থ দেরি করা, পেছনে পড়া।

ঈমান নিয়ে যেসব মুরজিয়া কথা বলে তারা দুই ধরনেরঃ

১. চরমপন্থী মুরজিয়া (আল মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুন)

২. ফক্বীহ মুরজিয়া (মুরজিয়াত আল ফুক্বাহা)

১. আল মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুনঃ

জাহম বিন সাফওয়ান এবং তার অনুসারীরা বলতঃ ঈমান হল সেটাই যা অন্তরে জানা হয়েছে ও সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। তারা অন্তরের কোন কাজকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করত না। নাউযুবিল্লাহ,

তারা ভাবত যে একজন মানুষ পূর্ণ মুমিন থাকবে এমনকি যদি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল(স) কে অভিশাপ দেয়, আল্লাহর আউলিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আল্লাহর শত্রুদের সমর্থন করে, মসজিদসমূহ ধ্বংস করে, কুরআন ও মুসলিমদের অসম্মান করে, কুফফারদের সাথে মিষ্টতাময় আচরণ করে ইত্যাদি।

তারা বলত যে, এসব হল গুনাহ এবং এগুলো অন্তরের ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।
যদি তাদের কাছে কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা থেকে কোন দলিল পেশ করে বলা হত যে এসকল কাজ করলে একজন লোক কাফির হয়ে যায়, তবে তারা বলত যে এই কাজগুলোর পেছনে অন্তরের সম্মতি বা জ্ঞান কোনটাই নেই।

তাদের মতে কুফর হওয়ার শুধু একটাই কারণ ছিল – অজ্ঞতা। আর ঈমান বলতেও একটা জিনিসই ছিল, জ্ঞান, অর্থাৎ অন্তরে তাগুত বর্জন ও আল্লাহকে গ্রহণের স্বীকৃতি।

অন্তরের সম্মতিজ্ঞাপন আর জ্ঞান কি একই বস্ত কি না এই ব্যাপারে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তাদের দেয়া ঈমানের সংজ্ঞা জঘন্যতম হওয়া সত্ত্বেও বহু মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুনা (চরমপন্থী মুরজিয়া) একে গ্রহণ করে।

সালাফদের মধ্যে অনেকেই (ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আহমাদ ইবন হাম্বাল, আবি আবাইদ ও অন্যান্যরা) মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুনের ধারায় ঈমানের এধরনের সংজ্ঞা প্রদানকারীদেরকে কাফির হিসেবে গণ্য করতেন।

এই আলেমগণ বলেছেন যে, কুরআনের ভাষ্যমতে শয়তান কাফির। শয়তানের কুফর তার ঔদ্ধত্যের কারণে, আদমকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে। এজন্যে নয় যে সে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছে। ফিরাউন ও তার লোকেদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেনঃ

“তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? ” [২৭:১৪]

ফিরাউনকে মুসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেনঃ

“তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন।” [১৭:১০২]

সত্য নবী মুসা (আ) ফিরাউনকে যে কথাটি বললেন তা প্রমাণ করে দেয় যে ফিরাউন আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল কিন্তু তবুও সে সর্বাপেক্ষা একরোখা ও সীমা অতিক্রমকারীদের একজন ছিল। তার কলুষিত মনোবাসনাই এর কারণ, জ্ঞানের স্বল্পতা নয়।

আল্লাহ বলেনঃ

“ফিরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দূর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী।” [২৮:৪]

ইহুদিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেনঃ

“আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।” [২:১৪৬]

এবং মুশরিকদের ক্ষেত্রেঃ

“তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।” [৬:৩৩]

২. মুরজিয়া আল ফুক্বাহাঃ

মুরজিয়া আল ফুক্বাহা হল তারা যারা বলে যে ঈমান হচ্ছে অন্তরের স্বীকৃতি ও জিহ্বার উচ্চারণ। তারা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না। মুরজিয়া আল ফুক্বাহারা কুফাতে ফক্বীহ ও আবেদ হিসেবে পরিচিত ছিল।

তারা স্বীকার করতো যে ঈমানের শাহাদাত বাণী উচ্চারন করা ব্যতীত কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না, কিন্তু জাহম বিন সাফওয়ান মনে করত যে এই সাক্ষ্যদান ছাড়াও মানুষ মুসলিম হতে পারে। মুরজিয়া আল ফুক্বাহা শয়তান, ফিরাউন ও অন্যান্য কাফেরদের ব্যাপারে বিশ্বাস করতো যে, তারা অন্তরে জানত যে নবীগণ সত্য প্রচার করছেন।

কিন্তু মুরজিয়া আল ফুক্বাহা স্বীকার করতো না যে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তাদের তর্ক জাহম বিন সাফওয়ানের মতই অসাড়। আমলের কারণে ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে – মুরজিয়া আল ফুক্বাহা এটা অস্বীকার করতো। মুরজিয়া আল ফুক্বাহা বিশ্বাস করতো যে, সকল আয়াত অবতীর্ণ হবার আগে ঈমানের বৃদ্ধি ঘটতো।
কারণ যখনই আল্লাহ একটা নতুন আয়াত অবতীর্ণ করতেন তখন এই আয়াতকে স্বীকৃতিদান (তাসদীক) পূর্বের আয়াতগুলোর প্রতি আনীত ঈমানের সাথে মিলিত হয়ে ঈমানকে বৃদ্ধি করতো।

কিন্তু কুরআন নাযিল সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর ঈমানের বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে তারা বলত যে সকল মুসলিমের ঈমান একই সমান। প্রথম যামানার আবু বকর বা উমার রাদিঃ দের ঈমান এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, আবু মুসলিম আল খোরাসানির মত অবাধ্য লোকের ঈমান একই সমান।

আমাদের সময়ে ইরজাঃ

আমাদের সময়ে সাধারণ মুসলিম এবং ইসলামের জন্যে কাজ করে যাওয়া দাঈদের মাঝে ইরজা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

সাধারণ মুসলিমদের ইরজার বিষয়টি সুপরিচিত; ঈমান অন্তরে থাকে, তারা তাদের আমলের উপর গুরুত্ব দেয় না বরং দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলকে খাট ও অবহেলা করে এবং বলে যে অন্তরের ঈমান ও পরিশুদ্ধ নিয়্যাতই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।
লক্ষণীয় যে, বর্তমানে ইসলামের জন্যে যারা কাজ করেন সেসব দাঈদের ইরজা ঈমানের সংজ্ঞাতে নয়। তারা ঈমানের খুব সুন্দর সংজ্ঞা দিতে জানেন। তারা বলেন, ঈমান হচ্ছে জিহ্বার উচ্চারণ, অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল। তারা আরো

বলেন, কথা ও কর্মের দ্বারা ঈমান গঠিত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে এটিই ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা।

কিন্তু যখনই এই সংজ্ঞাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার বিষয়টি আসে, বিশেষ করে সেসব বিষয় যা ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়, তখন স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে তারা আর সংজ্ঞাকে মানছেন না।

তাদের অধিকাংশই বলেন যে ঈমান ভাল কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং খারাপ কাজের দ্বারা হ্রাস পায়; ঠিক যেমনটি আহলুস সুন্নাহ বলে থাকে।

কিন্তু ঈমান বিধ্বংসী গুনাহগুলো তাদের দৃষ্টিতে শুধু ঈমানকে কমিয়ে দেয়, কখনোই ঈমানকে বিনষ্ট করে না শুধু একটা ক্ষেত্র ব্যতীত। আর তা হল অস্বীকৃতি জানানো, ইসতিহলাল অথবা অন্তরের বিশ্বাস, এবার গুনাহ বা আমল যতই বড় হউক না কেন। তারা বলে, যদিও রাসুল(স) বলেছেনঃ

"ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা আছে। সবচেয়ে উত্তম শাখা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃত দেয়া এবং নিম্নতম শাখা হল রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্ত সরানো। লজ্জা ঈমানের অংশ। " [মুসলিম]

ঈমানের সকল শাখা সমান নয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাখা কখনোই লজ্জা বা রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্ত সরানোর সমান নয়।

এধরনের কিছু শাখার অনুপস্থিতি ঈমানকে কমিয়ে দিতে পারে, যেমন লজ্জা। আর কিছু শাখার অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দানের অনুপস্থিতি।

খাওয়ারিজ ও তাদের অনুসারী চরমপন্থী তাকফিরি দলের লোকেরা এই শাখার যে কোন একটির অনুপস্থিতিকে ঈমান বিনষ্টকারী হিসেবে গণ্য করে।

অপরপক্ষে, নব্য মুরজিয়ারা বলে যে, সকল শাখার অনুপস্থিতি থাকলেও একজনের ঈমান শুধু হ্রাস পায় মাত্র।

তারা এই শাখারগুলোর কোনটির অনুপস্থিতিকেই ঈমান বিধ্বংসী মনে করে না, শুধুমাত্র 'ইসতিহলাল ও জুহুদ' বা বিশ্বাসের ক্ষেত্র ছাড়া। খাওয়ারিজ ও নব্য মুরজিয়া উভয়েই বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ির কারণে গোমরাহীর উপর আছে।

ঈমান ও কুফর সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহর অবস্থানঃ

সত্য পথের লোকেরা, নাজাতপ্রাপ্ত ফিরকার সদস্যরা এবং তায়েফাহ আল মানসুরার অন্তর্ভুক্তরা ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে মধ্যমপন্থার অনুসারী।

প্রথমত, তাদের মতে ঈমানের কিছু শাখার অনুপস্থিতি ঈমানকে দূর্বল করে দেয় কিন্তু পুরোপুরি নষ্ট করে না। এমন শাখাগুলোর দুটি ভাগ আছে-

ত যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে মুস্তাহাব

ত যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে ওয়াজিব

দ্বিতীয়ত, কিছু শাখা আছে যার অনুপস্থিতি ঈমানকে পুরোপুরি বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে ঈমানের শাখাগুলো মোট তিন ধরনেরঃ

ত যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে মুস্তাহাব,

ত যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে ওয়াজিব এবং

ত যে শাখাগুলো ছাড়া ঈমান বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়।

আহলুস সুন্নাহর লোকেরা কোন আমলকে কুরআন বা সুন্নাহর দলিল ব্যতীত এই তিন শ্রেণির কোন শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত করেন না।

" তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। " [২:৩২]

নব্য মুরজিয়াদের সাথে ঈমান ও কুফরের ধারণায় সবচেয়ে মিল পাওয়া যায় বাগদাদের মুরিসিয়্যাহ মুরজিয়াদের।

মুরিসিয়্যাহরা বিশর বিন গাইয়্যাস আল মুরিসি এর অনুসারী। সে বলত যে, ঈমান হচ্ছে অন্তরের স্বীকৃতি ও জিহ্বার উচ্চারণের সমন্বয়, আর কুফর হল অস্বীকার করা ও প্রত্যাখান করা। তাই তারা বলত যে কোন মূর্তির সামনে সিজদা করা কুফর নয়, কুফরের চিহ্ন মাত্র।

নব্য মুরজিয়ারা কোন আমলকেই ইসলাম বিনষ্টকারী মনে করে না। তারা বলে যে এর পেছনে ইসতিহলাল, জুহুদ বা দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। তাদের মতে এটিই হল কুফর।

আল্লাহকে অভিশাপ দেয়া, মূর্তির সামনে সিজদা দেয়া, আল্লাহর সম্পূর্ণ আইন থাকবার পরও নতুন করে আইন প্রণয়ন করা, আল্লাহর দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা করা – এসব কাজের কোনটাই কুফর নয় কিন্তু এই কাজগুলোর মাধ্যমে বুঝা যায় না যে কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার কুফরী কাজে বিশ্বাস করে।

কুফর তো হল তার বিশ্বাস, তার অস্বীকৃতি অথবা তার ইসতিহলাল (কাজটি স্বয়ং নয়)।

এভাবে নব্য মুরজিয়ারা মুসলিমদের জন্যে ভয়াবহ এক ক্ষতির দরজা খুলে দিয়েছে। বহু কাফির, নাস্তিক, মুনাফিক এবং যিন্দিক আল্লাহর দ্বীনকে আরামসে আক্রমণ করছে। নব্য মুরজিয়ারা তাগুত ও মুরতাদদের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করায়।

তারা তাগুত ও মুরতাদদের পক্ষ নিয়ে বলে যে তাগুতরা কখনই অন্তর দিয়ে এসব ব্যাপারে ভাবেনি। তাই দেখা যায় **তাগুতরা নিজেদের বাঁচাতে এইসমস্ত নব্য মুরজিয়াদের মত অনুগত সৈন্য খুব কমই পেয়েছে।**

এজন্যেই সালাফদের অনেকে ইরজা সম্পর্কে বলেছেনঃ

এই ধর্ম রাজাদের খুশি করে।

অনেকে বলেছেনঃ **আমরা মুরজিয়াদের ফিতনাকে খাওয়ারিজদের ফিতনা অপেক্ষা বেশি ভয় করি। তারা বলতেন যে খাওয়ারিজরা মুরজিয়াদের চেয়ে কম খারাপ এবং এটা আসলেই সত্য।**

কেননা খাওয়ারিজদের চরমপন্থার প্রাথমিক কারণ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমার প্রতি তাদের জেদী মনোভাব।

আর মুরজিয়াদের তরিকা মুসলিমদেরকে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘনের জন্যে উৎসাহিত করে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে শেখায় এবং কাফের মুশরিকদের জন্যে তাদের খারাপ কাজকে সোজা করে দিয়ে রিদ্দার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়।

তথ্যসূত্র-http://nobodhara.net/২০১৭/০৪/২৮/neomurjia/#more-৪৯৭

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬০৬

আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার প্রসঙ্গে মুফতি তাকি উসমানী দা:বা: এর দাবির পর্যালোচনা-৪

jamil mahmud

Junior Member

০৫-০৭-২০১৭

আর শাসক ছাড়া অন্যদেরকে হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়ার ব্যাপারটি আরো ব্যাপক:

নিম্নে এব্যাপারে ফিকহে হানাফির কিছু স্পষ্ট বক্তব্য দেওয়া হল:

ফাতহুল কাদির- ইবনুল হুমাম

وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ إلَّا بِالْقَتْلِ حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ الْمَرْأَةُ يَحِلُّ قَتْلُهَا أَيْضًا

وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الضَّرْبَ تَعْزِيرٌ يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَسِبًا ، وَصَرَّحَ فِي الْمُنْتَقَى بِذَلِكَ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ.

وَالشَّارِعُ وَلَّى كُلَّ أَحَدٍ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ { مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ } الْحَدِيثَ.

بِخِلَافِ الْحُدُودِ فَإِنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ تَوْلِيَتُهَا إلَّا لِلْوُلَاةِ ، وَبِخِلَافِ التَّعْزِيرِ الَّذِي يَجِبُ حَقًّا لِلْعَبْدِ بِالْقَذْفِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الدَّعْوَى لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْحَاكِمُ إلَّا أَنْ يَحْكُمَا فِيه

“আর যদি জানতে পারে যে, হত্যা করা ব্যতিত সে বিরত হবে না, তাহলে তার জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ আছে। আর যদি মহিলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে উভয়কেই হত্যা করা বৈধ।”

এটা এ ব্যাপারে পরিস্কার বিবরণ যে, প্রতিবাদ হিসাবে যেকোন ব্যক্তিই মারতে পারবে, যদিও সে সরকারী লোক না হয়। আলমুনতাকা কিতাবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছে। এর কারণ হল যেহেতু এটা অন্যায়কে হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়ার অন্তর্ভূক্ত। আর শরীয়ত প্রণেতা প্রত্যেককেই এই অধিকার দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "তোমাদের মধ্যে যে কোন অন্যায় কাজ দেখতে পায়, সে যেন তা হাত দ্বারা বাঁধা দেয়, যদি তা না পারে, তবে যবান দ্বারা।

কিন্তু হুদুদ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি)র বিধান এর থেকে ভিন্ন। শাসক ব্যতিত কারো জন্য সেটা কার্যকর করা জায়েয নেই। এমনিভাবে যে 'তা'যির' (শাসন হিসাবে প্রদত্ত শাস্তি) বান্দাকে অপবাদ দেওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে বান্দার হক হিসাবে ফরজ হয়, সেটার হুকুমও এর থেকে ভিন্ন। যেহেতু সেটা দাবি ও প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, এজন্য শাসক ব্যতিত কেউ সেটা কার্যকর করতে পারবে না। তবে যদি বাদি-বিবাদি মিলে কাউকে সালিস মানে, তবে সে পারবে।"

তাবয়ীনুল হাকায়িক

)قَوْلُهُ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ الْمَرْأَةُ لَهُ قَتْلُهَا أَيْضًا (وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الضَّرْبَ تَعْزِيرًا يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَسِبًا وَصَرَّحَ فِي الْمُنْتَقَى بِذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ وَالشَّارِعُ وَلِيُّ كُلِّ أَحَدٍ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ { مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ } الْحَدِيثَ بِخِلَافِ الْحُدُودِ لَمْ يَثْبُتْ وِلَايَتُهَا إلَّا لِلْوُلَاةِ وَبِخِلَافِ التَّعْزِيرِ الَّذِي يَجِب حَقًّا لِلْعَبْدِ بِالْقَذْفِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الدَّعْوَى لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْحَاكِمُ إلَّا أَنْ يَحْكُمَا فِيهِ ا هـ

"আর যদি মহিলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে উভয়কেই হত্যা করা বৈধ।" এটা এ ব্যাপারে পরিস্কার বিবরণ যে, প্রতিবাদ হিসাবে যেকোন ব্যক্তিই মারতে পারবে, যদিও সে সরকারী লোক না হয়। আলমুনতাকা কিতাবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছে। এর কারণ হল যেহেতু এটা অন্যায়কে হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়ার অন্তর্ভূক্ত। আর শরীয়ত প্রণেতা প্রত্যেককেই এই অধিকার দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "তোমাদের মধ্যে যে কোন অন্যায় কাজ দেখতে পায়, সে যেন তা হাত দ্বারা বাঁধা দেয়, যদি তা না পারে, তবে যবান দ্বারা।"

(ويكون) التعزير (بالقتل كمن) وجد رجلا مع امرأة لا تحل له، ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر، وكذا الغلام. (إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا) بأن علم أنه ينزجر بما ذكر (لا) يكون بالقتل (وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما(

(و) في منية المفتي (لو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعا) اه. بلا شرط إحصان، لانه ليس من الحد بل من الامر بالمعروف (وعلى هذا) القياس (المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شئ له قيمة) وجميع الكبائر والاعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم.

انتهى.
(ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية) قنية (و) أما (بعده) ف (- ليس ذلك لغير الحاكم)

“প্রতিবাদমূল শাস্তি হত্যার মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন কেউ কাউকে এমন মহিলার সাথে দেখলো, যে তার জন্য হালাল নয়। সে যদি মহিলাকে জোর করে, তাহলে মহিলার জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ এবং তার রক্ত মূল্যহীন হবে।

এমনিভবে ছেলে হলেও। যদি একথা জানা যায় যে, চিৎকার করলে বা অস্ত্র ছাড়া মারলে সে বিরত হবে না। আর যদি জানা যায় যে, উল্লেখিত বিষয়গুলো দ্বারা সে বিরত হবে, তাহলে হত্যার মাধ্যমে বাঁধা দেওয়া জায়েয হবে না। আর যদি মহিলাও ইচ্ছুক হয়, তাহলে উভয়কে হত্যা করবে।

মুনিয়্যাতুল মুফতি তে রয়েছে: যদি কাউকে তার স্ত্রীর সাথে বা মাহরামের সাথে যিনারত অবস্থায় দেখে, আর উভয়েই স্বেচ্ছায় করে, তাহলে উভয়কে হত্যা করবে। এখানে ইহসান তথা বিবাহিত হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য হবে না, যেহেতু এটা হদ নয়; বরং আমর বিল মারূফ।...

এমনিভাবে দাম্ভিক জালিম, ডাকাত, টেক্স উসুলকারী, যেকোন স্বল্পমূল্যের বা অধিক মূল্যের বস্তুর জুলুমকারী এবং তাদের দালাল ও সহযোগীদের বিধানও একই। এদের প্রত্যেককেই হত্যা করা বৈধ এবং হত্যাকারী সওয়াবপ্রাপ্ত হবে। গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় (বাঁধা দিতে গিয়ে) প্রত্যেক মুসলিমই এটা কার্যকর করতে পারবে, কিন্তু পরবর্তীতে শাসক ব্যতিত অন্য কেউ পারবে না।"

রদ্দুল মুহতার বা ফাতওয়ায়ে শামী

(قوله ويقيمه إلخ) أي التعزير الواجب حقا لله تعالى ؛ لأنه من باب إزالة المنكر ، والشارع ولى كل أحد ذلك حيث قال ﷺ " { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه } " الحديث ، بخلاف الحدود لم يثبت توليتها إلا للولاة ، وبخلاف التعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فإنه لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه

قال في القنية ؛ لأنه لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك ؛ لأنه نهي عن المنكر وكل واحد مأمور به ، وبعد الفراغ ليس بنهي ؛ لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمحص تعزيرا ، وذلك إلى الإمام

"এবং তা কার্যকর করতে পারবে প্রত্যেক মুসলিম, যেহেতু এটা অন্যায় বন্ধ করার অন্তর্ভূক্ত। আর শরীয়ত প্রণেতা প্রত্যেককে এর দায়িত্ব দিয়েছে। তিনি সা:বলেছেন: তোমাদের যে কোন অন্যায় কাজ দেখতে পায়, সে যেন তা হাত দ্বারা বাঁধা দেয়, যদি তা না পারে, তবে যবান দ্বারা।

কিন্তু হুদুদ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি)র বিধান এর থেকে ভিন্ন। শাসক ব্যতিত কারো জন্য সেটা কার্যকর করা জায়েয নেই। এমনিভাবে যে 'তা'যির' (শাসকের বিবেচনাধীন শাস্তি) বান্দাকে অপবাদ দেওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে বান্দার হক হিসাবে ফরজ হয়, সেটার হুকুমও এর থেকে ভিন্ন। যেহেতু সেটা দাবি ও প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, এজন্য শাসক ব্যতিত কেউ সেটা কার্যকর করতে পারবে না। তবে যদি বাদি-বিবাদি মিলে কাউকে সালিস মানে, তবে সে পারবে। 'কিনয়া'য় বলেছে: কারণ সে যদি অশ্লীল কাজে লিপ্ত অবস্থায় তাকে শাস্তি দেয়, তাহলে তার জন্য এটা করা জায়েয আছে। যেহেতু এটা নাহি আনিল মুনকার, আর প্রত্যেকেই এর ব্যাপারে আদিষ্ট। পক্ষান্তরে ক্ষান্ত হওয়ার পর এটা নাহি (বাঁধা দান) নয়। কারণ যা গত হয়ে গেছে, তার থেকে বাঁধা দেওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং তখন এটা নিরেট শাস্তি প্রদান হবে, আর এটা ইমামের দায়িত্ব।"

শরহে বেকায়া

فإنها تضمن بالإتلاف عند أَبي حنيفة، ويجوز بيعها. وقالا: لا تضمن، ولا يجوز بيعها، لهما أَنَّ هذه الأَشياء مُعَدَّةٌ للمعصية فبطل تقومها كالخمر، وأَنَّ إِتلافها أَمَر الشارع به، لقوله ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، و إِنكارها باليد إِتلافها، وهو لو أَتلفها بأَمر أُولي الأمر لا يضمن فبأَمر الشارع أَوْلى. ولأَبي حنيفة رحمه الله تعالى أَنه أَتلف مالاً ينتفع به من وجه سوى اللهو، ولا تبطُل قيمته لأَجل اللهو، كالأَمة المُغَنِّية.

(فَتَجِبُ قِيْمَتُهُ) أَي قيمة كُلِّ واحدٍ من السَّكَر، والمُنَصَّف، والمِعْزَف (لا لِلَّهْوِ) كما في الجارية المغنية، والكبش النطوح، والحمامة الطَّيّارة، والديك المقاتل، فإِنه تجب قيمتها غير صالحة لهذه الأُمور. وفي الجامع الصغير لِصَدْر الإِسلام: الفتوى في عدم الضمان على قولهما، لكثرة الفساد بين الناس،

حتى ذكر الصدر الشهيد أَنَّ البيت يهدم على مَن اعتاد الفِسْق و أَنواع الفساد، و أَنه لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين، وبإراقة العصير قبل أَن يشتد على مَنْ اعتاد الفِسْق.

“এগুলো (বিভিন্ন প্রকার খেলনা ও বাদ্য যন্ত্র) নষ্ট করলে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর মতে জরিমানা দিতে হবে এবং এগুলো বিক্রয় করা জায়েয আছে। সাহেবাইন বলেন: এগুলোর কোন জরিমানা নেই এবং এগুলো বিক্রয় করাও জায়েয নেই। সাহেবাইনের দলিল হল: এসকল বস্তুগুলো গুনাহের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। সুতরাং মদের মত এগুলোর মূল্য বাতিল হয়ে গেছে। আর এগুলো ধ্বংস করার ব্যাপারে স্বয়ং শরীয়ত প্রণেতা আদেশ করেছেন: কারণ রাসূল সা: বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে যে কোন অন্যায় কাজ দেখতে পায়, সে যেন তা হাত দ্বারা বাঁধা দেয়...”। এর এগুলোকে হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়া মানে ধ্বংস করা।

এছাড়া সে যদি এগুলো শাসকের আদেশে ধ্বংস করত, তাহলেও তার উপর জরিমানা আসতো না, সুতরাং শরীয়ত প্রণেতার আদেশে ভাঙ্গলে জরিমানা না আসা আরো স্বাভাবিক।

ইমাম আবু হানিফা রহ: এর দলিল হল: সে যে মালগুলো ধ্বংস করেছে, এগুলো দ্বারা আমোদ-প্রমোদ ছাড়াও ভিন্নভাবে উপকৃত হওয়া যেত। আর আমোদ-প্রমোদে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এগুলোর মূল্য বাতিল হয়ে যাবে না।...

সদরুল ইসলামের আলজামিউস সগীরে উল্লেখ রয়েছে: ফাতওয়া, সাহেবাইনের কথামত জরিমানা না হওয়ার ব্যাপারে। যেহেতু মানুষের মাঝে অন্যায়-অনাচার বেড়ে গেছে।

এমনকি শহীদ সদরুল ইসলাম এ পর্যন্ত উল্লেখ করেন যে, যারা পাপাচার ও বিভিন্ন প্রকার অন্যায়-অনাচার করে বেড়ায়, তাদের ঘর ধ্বংস করে দেওয়া যাবে। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বাড়িতে সকলে মিলে আক্রমণ করা এবং যারা পাপাচারে

অভ্যস্ত তাদের ঘরে রস, মদে পরিণত হওয়ার আগেই ফেলে দেওয়াতে কোন সমস্যা নেই।”

ফিকহে হানাফির এত পরিস্কার বক্তব্যগুলো থাকা সত্তেও সেগুলোর উপর শায়খের দৃষ্টি পড়েনি, পড়েছে একটি অস্বীকৃত কথার উপর। আর সেটাকেই নিজের কিতাবে মূল হুকুম বর্ণনার জন্য নিয়ে আসলেন। অথচ এই কথাটি কিতাব-সুন্নাহর বহু সংখ্যক সাধারণ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক এবং তার পক্ষে কেউ কোন দলিলও কেউ উল্লেখ করেনি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬৪৪

আল্লাহর পথে ব্যয় করা ফরজ

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-২৮-২০১৫

আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর জিহাদকে ফরজ করেছেন। তিনি আমাদের উপর জিহাদকে ফরজ করেছেন দুই ভাবে, জান ও মালের মাধ্যমে । আমাদেরকে ফরজ আদায় করতে হলে সাধ্য অনুযায়ী জান ও মাল দুইটিই ব্যয় করতে হবে। শুধু একটি আদায় করলে অন্যটি ফরিজা আদায় হবে না, যেটাতে আমরা অনেকেই ভূল করে থাকি। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ]٩:٤١[

তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।

আল্লাহর নবী বলেন:

و عن أنس (رض) : أن النبي عليه السلام قال : ((جاهدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم)) رواه أبو داود بإسناد صحيح

আনাস হতে বর্ণিত, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন: “ মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা জান-মাল ও বাক্য দ্বারা সংগ্রাম চালাও।”

আবদুল্লাহ আযযাম (রহ তাঁর ‘‘মুসলিমদের ভূমি প্রতিরক্ষা’’ লিখনীতে মাল দ্বারা জিহাদ করা অধ্যায়ে বলেন:

যদি মুজাহিদীনদের মালের প্রয়োজন হয় তখন একজনের মাল দ্বারা জিহাদ করা ফরদ। তখন মহিলা ও শিশুর মাল দ্বারা জিহাদ করাও ফারদ, এটি ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহীমাহুল্লাহ) বলেছেন। এই জন্যই জিহাদে যখন মালের প্রয়োজন

হবে তখন মাল জমা করা হারাম। ইবনে তাইমিয়্যাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আমাদের কছে এত সামান্য মাল আছে যে, হয় দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের উপর খরচ করতে হবে অথবা জিহাদে ব্যয় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা কি করবো?" তিনি বলেছেলেন, " যদিও দুর্ভিক্ষ পীড়িতরা মারা যায় তবুও আমরা জিহদকে অগ্রাধিকার দিব। মুসলিমদেরকে যখন শত্রুরা বর্ম হিসাবে ব্যবহার করে তখন ঐ মুসলিমরা আমাদের হাতে নিহত হয় অথচ এখানে দুর্ভিক্ষ পীড়িতরা আল্লাহর হুকুমের অধীনে মারা যায়।

আল কুরতুবী বলেছেন: "আলিমগণ একমত পোষন করেছেন যে, যাকাত পরিশোধের পরও যদি মুসলিমদের কোন পয়োজন থাকে; তবে তারা নিজেদের মাল থেকে খরচ করবে উক্ত প্রয়োজন পূরণ করার জন্য।"

ইমাম মালিক বলেছেন, মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্ত করা ফারদ। যদিও সমস্ত সম্পদ খরচ হয়ে যায়। এ ব্যাপারেও সবাই একমত পোষণ করেছেন।"

একজন ব্যক্তিকে রক্ষার চাইতে দ্বীনকে রক্ষা করা অগ্রাধিকার যোগ্য, এবং সম্পদকে রক্ষার চাইতে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা অগ্রাধিকার যোগ্য।

সুতরাং একজন মুজাহিদীন এর রক্তের চাইতে একজন ধনীর সম্পদ মূল্যবান নয়।

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের উৎকর্ষ সমূহ

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

۞ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

[৯:১১১]

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর

আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনইদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۖ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধনইসম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ ﷺ ـ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ باب أَىْ فُلُ هَلُمَّ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ".

সা'দ ইবন হাফস (র) ..... আবূ হুরায়রা (লা) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দুটি করে জিনিস ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক প্রহরী তাকে আহবান করবে। (তারা বলবে), হে অমুক। এদিকে আস। আবূ বকর (রাযিঃ) বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! তাহলে তো তার জন্য ক্ষতি নেই। নবী (ﷺ) বলেন, 'আমি আশা করি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ـ ﷺ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

আবূ ম''মার (র) ..... যায়দ ইবন খালিদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করে সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন জিহাদকারীর পরিবারইপরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশুনা করে, সেও যেন জিহাদ করল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ ﷺ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ " إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ ". ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا، فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالأُخْرَى، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ (ﷺ) قُلْنَا يُوحَى إِلَيْهِ. وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمِ الطَّيْرَ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا أَوَخَيْرٌ هُوَ. ثَلاَثًا. إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِالْخَيْرِ، وَ إِنَّهُ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْيُلِمُّ كُلَّمَا أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالآكِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বারে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য ভয় করি এ ব্যাপাওে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণের (মঙ্গলের) দরজা খুলে

দেওয়া হবে। তারপর তিনি দুনিয়ার নিয়ামতের উল্লেখ করেন। এতে তিনি প্রথমে একটির কথ বলেন, পরে দ্বিতীয়টির বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কল্যাণও কি অকল্যাণ বয়ে আনবে? নবী (ﷺ) নিরব রইলেন, আমরা বললাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে্ সমস্ত লোকও এমনভাবে নিরবতা অবলম্বন করল, যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুখের ঘাম মুছে বললেন, এখনকার সেই প্রশ্নকারী কোথায়? তাকে কল্যাণকর? তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। কল্যাণ কল্যাণই বয়ে আনবে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বসন্তকালীন উদ্ভিদ (পশুকে) ধ্বংস এবং ধ্বংসোন্মুখ করে ফেলে। কিন্তু যে পশু সেই ঘাস এ পরিমাণ খায় যাতে তার ক্ষুধা মিটে, তারপর রোদ পোহায় এবং মল মুত্র ত্যাগ করে, এরপর আবার ঘাস খায়। নিশ্চই এ মাল সবুজ শ্যামল সুস্বাদু। সেই মুসলিমের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়ত তা উপার্জন করেছে এবং আল্লাহর পথে, ইয়াতীম ও মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করেছে। আবার যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে খরচ করে তার দৃষ্টান্ত এমন ভক্ষণকারীর ন্যায় যার ক্ষুধা মিটে না এবং তা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৪৯

একজন মুরজিয়া এবং ইরজায় আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য !

abu_mujahid

Senior Member

০৫-০৭-২০১৭

উত্তর দিয়েছেন শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি হাফিযাহুল্লাহ

প্রশ্নকারীঃ সম্মানিত শায়খ আবু কাতাদা, আল্লাহ আপনাকে সত্যের উপর অবিচল রাখুন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ,

আমার প্রশ্নটি এমন একটি বিষয় নিয়ে, যা নিয়ে আমি বিভ্রান্তিতে আছি এবং আমার বিশ্বাস অন্য আরো অনেকেই এই বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত।

বিষয়টি হল একজন মুরজিয়া আর একজন ব্যক্তি যার মাঝে ইরজা রয়েছে – এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য কি?

আসলে আমার মনে প্রথম এ প্রশ্নের উদয় হয় যখন শায়খ আলবানীর মধ্যে ইরজা থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে এমন এক যুবক একজন শায়খকে টেলিফোন করলো, যিনি সঠিক আক্বিদার সাক্ষ্য দেন এবং তিনি সর্বদা সাহিহ আক্বিদার শিক্ষা দিয়ে এসেছেন।

তো যুবকটি সেই শায়খকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলো শায়খ আলবানি (আল্লাহ তার উপর রহম করেন এবং তার ভুলত্রুটি গুলো ক্ষমা করে দিন) কি একজন মুরজিয়া ছিলেন?

জবাবে শায়খ বললেন শায়খ আলবানির রাহিমাহুল্লাহ আক্বিদা সাহিহ ছিল তবে তার কথা মুরজিয়াদের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

শায়খ এ কথার মাধ্যমে কি বোঝালেন, আমি বুঝতে পারলাম না।

দ্বিতীয়ত, আমার কাছে একটি ক্যাসেট টেপ আছে, যেখানে শায়খ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ ঈমানের বিষয়ে তার একজন ছাত্রের সাথে আলোচনা করছিলেন।

আর তিনি এখানে বলেছেন আমল হল ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য নিছক শর্তমাত্র (শার্তকামাল)।
এই টেপে তিনি আরো বলেছেন যে, তার এই অবস্থানের কারনে কিছু মানুষ তাকে যে নাম দেয় (মুরজিয়া) তার ব্যাপারে তিনি সচেতন কিন্তু এটাই আমল ও ইমানের ব্যাপারে সঠিক অবস্থান।

আমার বিশ্বাস সম্মানিত শায়খ (শায়খ আবু ক্বাতাদা) আপনি নিজেও এই টেপটি শুনেছেন।

তাই আমার প্রশ্ন হলঃ

শায়খ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ এবং তার অনুসারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি, যারা তাদের দাবি দ্বারা পৃথিবী ভরে ফেলছে। আমি অতিরিক্ত সময় নিয়ে নেওয়ার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী এবং জাযাকাল্লাহ খাইর।

উত্তরঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এবং আল্লাহর কাছেই আমরা সাহায্য চাইএকজন ব্যক্তিকে খারেজি বলা আর একজন ব্যক্তির মাঝে খুরুজ আছে বলা, এবং একজন ব্যক্তিকে মুরজিয়া বলা আর একজন ব্যক্তির মাঝে ইরজা আছে বলার মধ্যে পার্থক্যটা নির্ভর করে দুই ব্যক্তির অবস্থার উপর।

তাই যে ব্যক্তি এই বিদাতের উসুল মেনে চলে এবং এর দিকেই ডাকে, তার উপর এই (মুরজিয়া)হুকুম আরোপিত হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি মুরজিয়াদের বিদাতী উসুল বা মূলনীতিসমূহ মেনে চলে এবং এই উসুলের প্রতি আহবান করে যে তাকে এই বিদাতের সাথে সংযুক্ত করা হবে এবং মুরজি বলা হবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি মুরজিয়াদের বিদাতী উসুল বা মূলনীতিসমূহ মেনে চলে না, এবং এই বিদাতি উসুল গ্রহন না করা সত্ত্বেও সে ইরজার কোন শাখায় পতিত হয় সে ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকে মুরজি বলার পরিবর্তে তাকে ইরজাগ্রস্থ বলা হবে।[১]

এটাই হল একজন মুরজি এবং একজন ইরজাগ্রস্থ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু যিনি শায়খ আলবানির রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তার উত্তর অস্পষ্ট।

কারন তিনি বলেছেন শায়খ আলবানির আক্বিদা সাহিহ ছিল। আর তিনি শুধুমাত্র শায়খের বক্তব্য ও উপস্থাপনা মুরজিয়াদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবার কথা উল্লেখ

করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন এ ছিল নিছক বলার ভুল কিংবা উপস্থাপনার ভুল। কিন্তু তার এই কথা (পুরোপুরি) সঠিক না।

যদিও শায়খ আলবানির আক্বিদার মূলনীতি সুন্নাহ থেকে, তথাপি তিনি তার আক্বিদায় ইরজার কিছু বৈশিষ্ট্য ধারন করেছিলেন।

তাই শায়খ আলবানি বলতেন ঈমান হল কথা এবং কাজ; কিন্তু তিনি এমনভাবে একে ব্যাখ্যা করতেন যার সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর ব্যাখ্যার অমিল থাকতো। আর এখানেই তিনি ইরজায় পতিত হয়েছেন, যখন তিনি বলেছেন আমল ঈমানের অস্তিত্বের আবশ্যক শর্ত (শার্ত সিহ্*হা) হতে পারে না।

শায়খ আলবানি ঘোষণা করেছেন যে মৌখিক স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস ঈমানের অস্তিত্বের শর্ত (শার্ত সিহ্*হা) – এর মাঝেও তার এই ধারণা উপস্থিত।

তিনি আমল ও মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন যা সালাফদের বক্তব্যের বিপরীত। বস্তুত এই ধারণা থেকেই সর্বপ্রথম ইরজার মাযহাবের সূচনা হয়েছিল। শায়খ আলবানির এই ভুল নিছক কথা বলা বা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন ভুল না, বরং তিনি এক্ষেত্রে আক্বিদার ব্যাপারে ভুল করেছিলেন। আর এভাবে তিনি ইরজার কিছু শাখাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

যারা শায়খ আলবানির ব্যাপারে এই অভিযোগের রদ করতে চায় তাদের অনেকে সালাফদের কিছু উক্তি উপস্থপন করে। যেমন তারা ইমাম আহমদের রাহিমাহুল্লাহ কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন, যিনি বলেছিলেন যে – ঈমান হল মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমল।
আর তারা শায়খ আলবানির সমর্থনে বলে যে তিনিও তো একই কথা বলেছেন যে – ঈমান হল মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমল।

এইভাবে তারা শায়খ আলবানিকে ইরজার অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে চায়। কিন্তু যারা বিভিন্ন বিভ্রান্ত ফিরকা ও তাদের মাযহাব সম্পর্কে অবগত তারা অনুধাবন করবেন যে এই কথা যৌক্তিক না।

আমি একটি উদাহরণ পেশ করছিঃ

আশারিরা বলে যে কুরআন হল আল্লাহ তা'আলার কালাম। কিন্তু তাদের এই কথা এটা প্রমানের জন্য যথেষ্ট যে তারা এই বিষয়ে নবীর ﷺ এবং সাহাবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন আক্বিদার উপর আছে?

প্রত্যেক তলিবুল এই প্রশ্নের উত্তর জানে – না।

যদিও তাদের এই বক্তব্য সঠিক কিন্তু তারা একে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যা সত্যের সীমানার বাইরে এবং আহলে হক্ব এই ব্যাপারে জ্ঞাত। আর তাই আশারীদের মতে এক্ষেত্রে আল্লাহ্*র "বাণী" মানে আল-কাদিমের (শাব্দিক অর্থ, আদি। এর দ্বারা তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বোঝায়)সত্তা থেকে উৎসারিত কালামের অভিব্যক্তি মাত্র, স্বয়ং আল্লাহ্*র বলা কথা নয়।]

কিন্তু কুরআনের যে অক্ষর ও শব্দগুলো আমরা তিলাওয়াত করি তারা এগুলোকে সরাসরি আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করে না। কারন তারা উচ্চারন ও অর্থের মাঝে পার্থক্য করে। সুতরাং তারা একটি সঠিক কথা বলে ["কুরআন হল আল্লাহর বাণী"], কিন্তু তারা এটার এমন একটা ব্যাখ্যা করে যা এর প্রকৃত অর্থের থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ তারা একটিতে ঠিক থাকলেও অপরটিতে ভুল করে।

তেমনিভাবে শায়খ আলবানি ইমানের আলোচনায় একটি সঠিক কথা বলেছেন – "ঈমান হল মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমল।" কিন্তু তিনি এই সঠিক কথাটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা আহলে হক্বের ব্যাখ্যার সাথে মেলে না। কারন মৌখিক ও স্বীকৃতি ও আমলের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

আর তাই তিনি সকল ধরণের কুফর ইতিক্বাদিকে (অন্তরের বিশ্বাস সংক্রান্ত) কুফর আকবর বলে গন্য করেছেন, এবং বলেছেন কোন আমলের কারনে কোন ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয় না।

আর সকল ধরনের কুফর আমালিকে তিনি কুফর আসগর বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটি বাতিল ধারণা এবং আল্লাহ্* তা'আলার দ্বীনের ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা।

আর শায়খ আলবানি বলেছেন আমল হল ঈমানের পূর্ণতার শর্ত, এই কথাটি সঠিক নয়, এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর ﷺ হাজার হাজার লাইন এবং আহলুল ইলমের কথার দ্বারা এই কথাটি ভুল প্রমাণিত।

শুধুমাত্র এই বিষয়টির উপরই প্রথম যুগ থেকে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত অসংখ্য বই লেখা হয়েছে আল্লাহ্* আমাদের এগুলোকে খুঁজে বের করার তৌফিক দান করুক। একমাত্র আল্লাহ্*ই সমস্ত কিছু সম্ভব করার ক্ষমতা রাখেন।

---

[১] অর্থা যে ব্যক্তি মুরজিয়াদের মূলনীতিসমূহ মেনে চলে এবং এর প্রতি আহবান করে সে মুরজিয়া, কিন্তু যে ব্যক্তি ইরজার মূলনীতি মেনে চলে না ও গ্রহন করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইরজার কোন একটি শাখায় পতিত হয় তার ক্ষেত্রে বলা যায় যে সে ইরজা দ্বারা আক্রান্ত বা ইরজাগ্রস্থ।

সূত্রঃ https://www.kalamullah.com/sects০৪.html

সূত্রঃ http://nobodhara.net/২০১৭/০৩/১১/irjaandmurjia/#more-১৬৫

বিন কাসিমের রণ বেশে

কাঁপন তুলো হিন্দ দেশে!

দিকে দিকে লাগাও নারাহ

জিহাদেই শান্তির ফোয়ারা!!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬৫১

স্কুল অফ জিহাদ

Abu Anwar al Hindi

Senior Member

০৯-১২-২০১৭

আউযুবিল্লাহহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া ‘আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি সাল্লাম তাসলিমান কাসীরা

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

‘আম্মা বা’আদ

বাস্তবতা ১ঃ জিহাদের দাওয়াহর প্রায় ৯৫% জুড়ে থাকে ‘কেন জিহাদ’ – এ নিয়ে আলোচনা। ‘কীভাবে জিহাদ’ – এ নিয়ে আলোচনা হয় বাকি ৫% এ। সংখ্যাটা ৫-এর চাইতে আরো ছোটও হতে পারে। সুতরাং জিহাদ সংক্রান্ত অধিকাংশ লেখা, বক্তব্য, ভিডিও ইত্যাদি থেকে ‘কেন জিহাদ করতে হবে’ – এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা পেলেও, কীভাবে জিহাদ করতে হবে এ নিয়ে খুব বেশি কিছু জানা যায় না।

আর এর পেছনে শক্ত কারনও আছে। উম্মাহর মূল সমস্যা হল তারা বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা, দুনিয়ার ভালোবাসা, মৃত্যুকে অপছন্দ করা – ইত্যাদি কারনে বিশুদ্ধ তাওহিদ সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ অবস্থায় আছে। তাওয়াগিতের পরিচয় ও তাদের বর্জন করার ব্যাপারে বেখেয়াল হয়েছে। আল ওয়ালা ওয়াল বারা বিস্মৃত হয়েছে। ফরয দায়িত্ব জিহাদ থেকে দূরে সরে আছে। তাই যারা বিশ্বজুড়ে জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের মূল ফোকাস থাকে ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগাবার। এছাড়া “কীভাবে জিহাদ’ – এ আলোচনার মধ্যে রণকৌশল, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পলিসি, স্ট্র্যাটিজি (strategy), ট্যাকটিক (tactics) ইত্যাদি বিষয় থাকে। যদি এধরণের বিষয় পাবলিকলি আলোচনা করা হয়, গণমানুষের সামনে প্রকাশ করা হয় তাহলে সেটা মুজাহিদিনকে কৌশলগতভাবে

ঝুকিপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যায়। কারন মুরতাদ তাওাগীত ও কুফফারের সামনেও বিষয়গুলো প্রকাশ পেয়ে যায়।

একইসাথে, এও সত্য যে স্ট্র্যাটিজিক ও ট্যাকটিকাল বিষয়ে আলোচনা প্রত্যেক জিহাদ সমর্থক বা জিহাদি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তির জন্য মানানসই না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ বিষয়গুলো জানানোও আবশ্যক না। সর্বোপরি, জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত – এ সত্য উপস্থাপনের পর একজন মুমিনের প্রথম দায়িত্ব হল সে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া। আর যেহেতু জিহাদ একটি জামাতবদ্ধ ইবাদত তাই বব্যক্তির উপর আবশ্যক হল জামাতবদ্ধ হওয়া। কারন যা কিছু আবশ্যককে অর্জনের জন্য প্রয়োজন তার সবকিছুই আবশ্যকে পরিণত হয়। আর যখন ব্যক্তই জামাতবদ্ধ হয়, তখন জামা'আহ তাকে দিকনির্দেশনা দিতে থাকে ও দায়িত্ব বন্টন করে। তাই জিহাদি আন্দোলনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে, জনসাধারনকে আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার ক্ষেতরে, 'জিহাদ কীভাবে?' – প্রাথমিক পর্যায়ে এ আলোচনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয় না।

তবে অনস্বীকার্য সত্য হল, কোন দল বা আন্দোলনের কাজ, কাজের প্রকৃতি, চিন্তাধারা, আদর্শ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, নীতিমালা, আক্বিদা, সিলেবাস, পলিসি - ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে কর্মীদের পক্ষে সম্ভব না কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার। এও অনস্বীকার্য যে কেবলমাত্র পাবলিকলি যেসব মিডিয়া রিলিজ (বই, রিসালাহ, বয়ান, ভিডিও) পাওয়া যায় তার মাধ্যমে এসবগুলো বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব না। তবে আলহামদুলিল্লাহ কত বেশ কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক মুজাহিদিন মিডিয়াগুলো এবং, গত প্রায় দুই বছর ধরে বাংলাভাষার মিডিয়াগুলোতে ধীরগতিতে হলেও এসব বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা উঠে আসছে। এজন্য জিহাদি আন্দোলনের সাথে যুক্ত সকল ভাই এবং সকল সমর্থক ভাইদের উচিৎ জিহাদি মিডিয়ার রিলিজসমূহ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকা, বিশেষ মুজাহিদিন উলামা ও উমারাহর কিতাব, রিসালাহ ও বয়ানগুলো গভীর মনোযোগের সাথে পড়া ও এ নিয়ে চিন্তা করা।

এ দীর্ঘ ভূমিকার উদ্দেশ্য কী?

উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশে এবং উপমহাদেশে জিহাদের ব্যাপারে মুজাহিদিনের ভূমিকা কী হবে? – এ প্রশ্নের ব্যাপারে আমাদের চিন্তাকে পরিকপক্ক ও স্বচ্ছ করার গুরুত্ব সম্পর্কে ভাইদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কারন জিহাদের ক্ষেত্রে জযবা যেমন থাকা প্রয়োজন তেমনিভাবে উপযুক্ত সময়ে জিহাদি আন্দোলনের প্রয়োজনেই সেই জযবাকে কন্ট্রোল করারও প্রবণতা প্রয়োজন। দলীল-আদিল্লা জানা থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আসলিহাত ও এর ব্যবহারিক জ্ঞান। ব্যবসা হালাল না হারাম হচ্ছে – তা জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনিভাবে জানা প্রয়োজন ব্যবসা কতোটুক লাভজনক হচ্ছে।

বাস্তবতা ২ঃ বিভিন্ন কারনে এ ভূমিতে জিহাদি আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে, এবং আন্দোলনের পক্ষে দাওয়াত দানকারী, এমনকি আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের মধ্যেও উপরে আলোচিত বিষয়ের বেশ কিছুর ব্যাপারে সঠিক বা যথেষ্ট ধারণা নেই। সব ব্যক্তির সব ব্যাপারে ধারণা থাকা অপরিহার্যও না। তবে নিজেদের অজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত থাকা এবং প্রয়োজনের নতুন কিছু শেখার জন্য ইতিবাচক মনোভাব সবার মধ্যে থাকা প্রয়োজন। তিনি যে দলেরই হোন না কেন। এক্ষেত্রে কে কতোদিন ধরে কাজের সাথে যুক্ত আছে, কে কার আগে কাজ শুরু করেছে, সাধারন মানুষের কাছে কার মর্যাদা বা অবস্থান কতোটুকু – ইত্যাদি বিষয় প্রাসঙ্গিক না। বরং এসব বিষয় নিয়ে অধিক চিন্তা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাড়ায়।

একথাগুলো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনিভাবে সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উপরোক্ত বাস্তবতাগুলোর বিবেচনায় এ দুর্বল বান্দা চেষ্টা করবে নিজ তুচ্ছ সামর্থ্য অনুযায়ী জিহাদি আন্দোলনের সাথে যুক্ত সকল ভাই ও সমর্থকদের জন্য উল্লেখিত এমন সব বিষয়ে কিছু বিষয় পরিষ্কার করা যেগুলো সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারায় পরিপক্কতা ও স্বচ্ছতা আসা দরকার, বিইযনিল্লাহ। ইনশা আল্লাহ এর মধ্যে মুজাহিদিনের কল্যাণ নিহিত আছে। কারন যতোক্ষন নিজ দায়িত্ব, উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে কেউ পূর্ণ সচেতন হয় না, ততোক্ষণ তার পক্ষে যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না।

আল্লাহ সহজ করুন। ওয়ামা তাওফিক্বি ইল্লাহ বিল্লাহ।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিগণের উপর, কেয়ামত পর্যন্ত।

Last edited by Abu Anwar al Hindi; ০৯-১২-২০১৭ at ০৯:৫২ PM.

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি হয়, আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৭১১

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের প্রসঙ্গে মুফতি তাকি উসমানী দা:বা: এর দাবির পর্যালোচনা-৩

jamil mahmud

Junior Member

০৫-০৩-২০১৭

ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যায়

যদি অন্যায়ে বা জুলুমে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলিম শাসক হয়, আর সে রাষ্ট্রে নামায (তথা ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করে, তবে তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য লড়াই করা যাবে না। তবে তার নির্দিষ্ট মুনকার ও জুলুমটিকে বন্ধ করার জন্য হিম্মত থাকলে অবশ্যই হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়া যাবে। কারণ ইসলাম এক মুহূর্তও অন্যায় চলতে থাকাকে সহ্য করে না।

যেমন ইমাম আহমাদ রহ: বলেন:

জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম- ইবনে রজব হাম্বলী

((الحديث)) ((٢))يخلف من بعدهم خُلوفٌ ، فمن جاهدَهم بيدِه ، فهو مؤمنٌ ، وهذا يدلُّ على جهاد الأمراءِ باليد . وقد استنكر الإمامُ أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود ((٣)) ، وقال : هو خلافُ الأحاديث التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها بالصَّبر على جَوْرِ الأئمة . وقد يجاب عن ذلك : بأنَّ التَّغييرَ باليدِ لا يستلزمُ القتالَ . وقد نصَّ على ذلك أحمدُ أيضاً في رواية صالحٍ ، فقال : التَّغييرُ باليد ليسَ بالسَّيف والسِّلاح ، وحينئذٍ فجهادُ الأمراءِ باليد أنْ يُزيلَ بيده ما فعلوه مِنَ المنكرات ، مثل أنْ يُريق خمورَهم أو يكسِرَ آلات الملاهي التي لهم ، ونحو ذلك ، أو يُبطل بيده ما أمروا به مِنَ الظُّلم إن كان له قُدرةٌ على ذلك، وكلُّ

هذا جائزٌ، وليس هو من باب قتالهم، ولا مِنَ الخروج عليهم الذي ورد النَّهيُ عنه، فإنَّ هذا أكثرُ ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده.

"তাদের পরে আসবে অযোগ্য উত্তরসূীগণ, যে তাদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করবে, সে মুমিন..." এ হাদিসটি শাসকদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ বৈধ হওয়াকে প্রমাণ করে।

ইমাম আহমাদ রহ: আবু দাউদের রেওয়ায়েতে হাদিসটিকে মুনকার বলেছেন। (তবে মুসলিম রহ: এটা সহীহ সনদে রেওয়ায়াত করেছেন।) তিনি বলেন: 'এটা ঐ সকল হাদিসের বিরোধী, যেগুলো শাসকদের জুলুমের উপর সবর করতে আদেশ করে'।

এর উত্তর দেওয়া হয় এভাবে যে: হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়া যুদ্ধকে আবশ্যক করে না। আবু সালিহের রেওয়ায়াতে স্বয়ং ইমাম আহমাদও স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন: তিনি বলেন: হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়া; তরবারী বা অস্ত্র দ্বারা নয়, (অর্থাৎ যুদ্ধ করা নয়)।

এমতাবস্থায় শাসকদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করার উদ্দেশ্য হল: তারা যে অন্যায় কাজ করে, তা হাত দ্বারা বন্ধ করা। যেমন তাদের মদ ফেলে দেওয়া, বিনোদন উপকরণগুলো ভেঙ্গে ফেলা এধরণের, অথবা তারা যে জুলুমের আদেশ করে, সামর্থ্য থাকলে তা নিজ হাত দ্বারা বাতিল করা। এ সবগুলোই জায়েয। এর মানে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নয়, যেটার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কারণ এতে (শাসককে হাত দ্বারা বাঁধা দিতে গেলে) সর্বোচ্চ আশঙ্কা হল: আদেশকারী ব্যক্তি একা নিহত হবে।"

এ ব্যাপারে বিখ্যাত হানাফি ফকীহ আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রহ: এর বক্তব্য:

আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রহ: ফাতওয়া শামীতে যা বলেন, তার সারকথা হল: ইসলামী শাসক প্রজাদের উপর জুলুম করলে কিংবা তাদের হক নষ্ট করলে যেসব প্রজা মজলুম হয়েছে বা যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে তারা শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবে। এ অস্ত্র ধারণ শাসককে হটিয়ে ক্ষমতা দখল কিংবা নতুন শাসক নিয়োগ দেয়ার জন্য নয়, বরং জুলুম দূর করার জন্য এবং হক আদায় করার জন্য। অন্যান্য জনগণ যদি মনে করেন মজলুমদের পক্ষ হয়ে শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে জুলুম দূর করা যাবে তাহলে তাদের জন্য আবশ্যক হবে মজলুমদেরকে

সাহায্য করা। আর যদি মনে হয় জুলুম দূর করা সম্ভব হবে না, বরং অহেতুক মারামারি হবে, তাহলে তারা সাহায্য করবে না। তবে মজলুমরা যদি অস্ত্র চালিয়ে যায় তবে তাদের কোন গুনাহ হবে না।

এবার ফাতওয়া শামীর উদ্ধৃতি দেখুন:

في "الدر المختار": وفي المبتغى لو بغوا لأجل ظلم السلطان ولا يمتنع عنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم. اهـ

قال ابن عابدين في الشرح: لكن في الفتح : ويجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا إن أبدوا ما يجوز لهم القتال كأن ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلما لا شبهة فيه بل يجب أن يعينوهم حتى ينصفهم ويرجع عن جوره ، بخلاف ما إذا كان الحال مشتبها أنه ظلم مثل تحميل بعض الجبايات التي للإمام أخذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه .ا هـ

قلت : ويمكن التوفيق بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه وإلا فلا كما يفيده قول المبتغى ، ولا تمتنع عنه تأمل. اهـ

"আদদুররুল মুখতারে রয়েছে: 'মুবতাগা'য় রয়েছে: যদি প্রজাগণ শাসকের জুলুমের কারণে বিদ্রোহ করে, আর শাসক তা থেকে বিরত না হয়, তখন অন্যান্য লোকদের জন্য শাসকেরও সাহায্য করা উচিত নয় এবং প্রজাদেরও সাহায্য করা উচিত নয়।

ইবনে আবেদিন শামী রহ: ব্যাখ্যায় বলেন: কিন্তু ফাতহুল কাদিরে রয়েছে: যাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে, তাদের প্রত্যেকের উপর আবশ্যক হল ইমামের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করা। তবে যদি প্রজাগণ এমন কোন প্রমাণ পেশ করে, যার ভিত্তিতে তাদের জন্য যুদ্ধ করা জায়েয হয় তবে ভিন্ন। যেমন শাসক তাদের উপর বা অন্যদের উপর এমন জুলুম করেছে, যা জুলুম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বরং সে সময় অন্যান্য লোকদের উপর বিদ্রোহকারী প্রজাদেরকে সাহায্য করা

ফরজ, যতক্ষণ না সে তাদের প্রতি ইনসাফ করে এবং স্বীয় জুলুম থেকে ফিরে আসে।

পক্ষান্তরে যদি জুলুমের বিষয়টি অস্পষ্ট হয়, যেমন এমন ধরণের ট্যাক্স আরোপ করা, যা গ্রহণ করার বৈধতা শাসকের রয়েছে। ফলে বড় সমস্যা দূর করার জন্য ছোট সমস্যায় ফেলে।

আমি বলি: উভয় বক্তব্যের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে: যদি শাসককে জুলুম থেকে বিরত করা সম্ভবপর হয়, তবে বিদ্রোহকারী প্রজাদেরকে সাহায্য করা ফরজ। আর যদি বিরত করা সম্ভবপর না হয় তবে সাহায্য করা ফরজ নয়।”

এই আলোচনাটি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের মুনকার ও জুলুমকে হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়ার ব্যাপারে। আর শাসক ছাড়া অন্যদেরকে হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়ার ব্যাপারটি আরো ব্যাপক।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬০০

স্বর্ণ দিনারের প্রত্যাবর্তন এবং জুলুমের অর্থনীতির পতন

ibn jiad

Member

১০-৩১-২০১৭

লেখাটি যদিও আইএসের একটি ভিডিও থেকে নেয়া হয়েছে। ফেসবুকের মুহাম্মদ আল বেংগলি নামক এক আইএসের সমর্থক লিখেছেন। কিন্তু এতে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে।

দুনিয়ার অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ, এমনকি নামধারী ইসলামী অর্থনীতিবিদরাও সমগ্র বিশ্বকে অর্থনীতির যে সমাধান দিয়ে দুনিয়া চালাচ্ছেন, তা আসলে মস্ত বড় প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়। তারা জেনে, না জেনে আমেরিকাকে একটা বিশাল ফেইভার দিয়ে যাচ্ছেন। সেসকল নামধারী ইসলামী অর্থনীতিবিদরাও মুসলিম উম্মাহকে ধোঁকা দিচ্ছেন ইসলামী ব্যাংকিং নামক প্রতারনার ফাঁদ সৃষ্টি করে। তাদের সমাধানের সাথে কি আদৌ ইসলামী অর্থনীতির কোন মিল রয়েছে...??? এই যুগে আমেরিকা ফাসাদের বীজ বপন করে এবং ইহুদীরা তা চাষ করে। দাসত্বের এক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নেতৃত্ব প্রদান করে ফ্যাডারেল ডলার নোট নামক এক্ত টুকরো কাগজের উপর ভর করে। যা তারা একাই ছাপিয়েছে এবং বাকি পৃথিবীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের সকল জুলম ও সীমালঙ্গনের পরও তারা বোকার মত আশা করে যে তাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের পাপ অবাধে চলতে থাকবে। তারা তাদের কুফর দ্বারা স্বল্প সময়ের জন্য অন্ধ হয়, নতুন যুগের উদয়ের ব্যাপারে অচেতন অবস্থায়। কারন নবুওয়্যাতের মানহাজ সকল যুগে কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে আত ত্বইফাতুল মানসুরাহ'র হাত ধরে। তাদের শয়তানী অর্থনীতি ব্যবস্থার উপর প্রথম আঘাত হানে পুঁজিবাদের দুই মূর্তিকে (টুইন টাওয়ার) গুড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। যা আমেরিকাকে আফগানিস্তান ও ইরাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। যার দরুন তারা অস্বাভাবিকভাবে ঋণে জর্জরিত হয়েছে। আর আমেরিকার পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে দ্বিতীয় এবং যে শক্তিশালী আঘাত হানা হবে তা হল, স্বর্ণ দিনারের প্রত্যাবর্তন। যা তাদের জালিয়াতী ডলার নোটকে ধ্বংসের দিকে ছুড়ে মারবে। আল্লাহর শরীয়ত মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্য নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের সম্পদের

নিরাপত্তার বিধান। বস্তুত সোনা এবং রুপা নির্দিষ্ট এবং সাধারণভাবেই পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। প্রাচীন ব্যাবিলন (যা আজকের ইরাকের দক্ষিণাংশ), যেখানে দুই নদী এই শহরের জীবন রেখা, যা ব্যবসা বানিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এবং বার্লি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জমি চাষের উৎস। অন্যান্য অন্তর্নিহিত মূল্য বিশিষ্ট পণ্যদ্রব্যের সাথে যেসকল পণ্যদ্রব্যের মধ্যে মূল্য বিদ্যমান প্রধান খাদ্যদ্রব্য, যেমন বার্লি এবং খেজুর মানুষের পণ্য এবং সেবা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ছিল। কারন সাধারণভাবেই মানুষের এসকল পন্যের প্রয়োজন ছিল। মানুষের বার্লির প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা খাবার জন্য রুটি তৈরি করতে পারে। যা ব্যবহারের পর থেকে যেত, তা পরবর্তীতে পণ্য এবং সেবার মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হত। উদাহরণস্বরূপ, মেসোপটেমিয়ার একজন লোক ২ কেজি খেজুরের মুল্যে একটি কুড়াল ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু এই পন্যদ্রব্যসমুহ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা রয়েছে। প্রধান খাদদ্রব্যের নিম্ন সংরক্ষিত মূল্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি খেজুরের মূল্য একটি বাড়ির মুল্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। যদি কোন ক্রেতা খেজুরের মুল্যে কোন বিক্রেতার থেকে একটি বাড়ি কিনতে চান, তাহলে তার অনেক খেজুরের প্রয়োজন। এবং বহনযোগ্যতা তখন একটি সমস্যা হয়ে যায় এবং খেজুরগুলো সংরক্ষণের জায়গার দরকার হয়। খেজুরের মেয়াদ উত্তীর্ণের বিষয়টি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এভাবে উক্ত পণ্যসমূহের মূল্য দূরত্ব, জায়গা, সময়ের উপর নির্ভর করে। কিংবা বিক্রেতা বিনিময় হিসেবে খেজুর বা অন্য পণ্য নাও নিতে পারে। এবং কোন কিছু ক্রয় করার জন্য বিভিন্ন ধরণের পণ্য হাতে রাখাও বাস্তব সম্মত নয়। আদর্শ বিনিময়ের মাধ্যম না থাকলে পণ্য এবং সেবার পরিমাপের ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফিতরত এবং প্রাকৃতিক স্বভাব থেকেই (যা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন) মানুষ মূল্যবান ধাতুর প্রতি মুগ্ধ, যার মধ্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য অন্যতম। কারন আল্লাহ তা'আলাই সেগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে, নারী, সন্তান-সন্ততী, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহর নিকটই হল উত্তম আশ্রয়"। [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৪]

আল্লাহ তা'আলা সোনা এবং রুপাকে সকল পণ্য এবং সেবার পরিমাপের আদর্শ মুল্যমান হিসেবে বানিয়েছেন। এবং সেগুলোকে উক্ত কাজের জন্য যথার্থভাবে তৈরি করেছেন। সোনা এবং রুপা বিভাজ্য, কেননা এগুলোকে বিভিন্ন টুকরায় ভাগ করা যায় এবং এতে এগুলোর মূল্য এবং মানের কোন পার্থক্য হয়না। একে গলিয়ে অলংকার বানানো যায়, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না কিংবা এর নির্দিষ্ট কোন স্থায়িত্বকাল নেই। অর্থাৎ তাদের সংরক্ষিত মুল্যমান স্থায়ী, সবাই এর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তা সীমিত পরিমাণে বিদ্যমান, কেউ নিজে থেকে তা বানাতে পারেনা। একটি ক্ষুদ্র পরিমান সোনা উচ্চ সংরক্ষিত মুল্যমান বহন করে। তাই সোনা এবং রুপা ব্যবহার করে ব্যবসা বানিজ্য করা অধিক কার্যকর এবং সকল কিছুর মূল্য সোনা এবং রুপায় নিরধারন করা সম্ভব। এখন কোন ব্যক্তি সহজেই সোনা রুপা ব্যবহার করে বিক্রেতা হতে বাড়ি ক্রয় করতে পারবেন। কিছু শতাব্দী আগে, মিশরে ইউসুফ (আঃ) এর যুগে, যখন তিনি নিজ ভাইদের দ্বারা প্রতারিত হন এবং ঘটনাক্রমে বাজারে বিক্রির জন্য একজন দাসে পরিনত হন, তখন কার্যকরী ব্যবসা বানিজ্যের জন্য দুর্লভ ধাতুসমূহ ধাতব মুদ্রা হিসেবে জারি ছিল। আল্লাহ বলেন, "তারা তাকে (ইউসুফ আঃ কে) কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গনাগুনতি কয়েক দিরহামে (রুপার মুদ্রা) এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল। [সূরা ইউসুফঃ ২০]

মিশরের নীলনদের মত সময়ের বয়ে যাওয়ার পরিক্রমায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে সেই দাস ইউসুফ (আঃ) কে ভূমির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেন। এবং খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করে মিশরের দুর্ভিক্ষ হতে লোকদের রক্ষার সম্মান দান করেন। ওইসময় মানুষ বিভিন্ন যায়গা হতে মিশরে জমায়েত হয় ব্যবসা বানিজ্যের জন্য এবং সোনা ও রুপার মুদ্রা দীর্ঘ সময়ের জন্য সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়ের মাধ্যমে পরিণত হয়। চীন, হিজরী সালের ১৭০০ বছর পূর্বে, ছোট চতুর্ভুজাকৃতির সোনা বাবসা বানিজ্যে ব্যবহার করত। হিজরী সালের ১৩০০ বছর পূর্বে, লিডিয়া রাজ্য সোনা এবং রুপা থেকে খাঁটিভাবে প্রস্তুতকৃত মুদ্রা ব্যবহার করত। হিজরতের ১০৫০ বছর পূর্বে, এথেন্স স্বর্ণ মুদ্রা ব্যবহার করে। হিজরতের ৭০০ বছর পূর্বে ইউরোপিয়ানরা (রোমান) "আউরিউস" নাম স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করে। হিজরতের ১০০ বছর পূর্বে পারস্য "দ্রাকমা" নামক রৌপ্য মুদ্রা বা দিরহাম ব্যবহার করে। ইতিহাসের সবচেয়ে সুদৃঢ় উত্তরাধিকারের উত্তানের দিকে অগ্রসর হলে দেখা যায়, রাসুল (স) কে যখন আল্লাহ তা'আলা জমিনে কর্তৃত্ব দান করলেন এবং

ইসলামকে দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তা পরিপূর্ণ করলেন, তখন অর্থনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিসয়ও এতে ছিল। তখন আর্থিক লেনদেনসমূহ সম্পাদিত হয়েছে প্রধান খাদ্যদ্রব্য ও লক্ষনীয়ভাবে খেজুর দ্বারা এবং মূল্যবান ধাতব মুদ্রা দ্বারা, যা অজন অনুসারে পরিমাপ করা হত। তখন তিন ধরণের ধাতব মুদ্রা প্রচলিত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সোনার দিনার, পারস্য সাম্রাজ্যের রুপার দিরহাম এবং "ফালস" নামক এক ধরণের তামার মুদ্রা যা স্থানীয় ছোট লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। রাসুল (স) এগুলোকে পরিবর্তন করেননি। বরং সোনা ও রুপার গুরুত্ব দিনার এবং দিরহাম হিসেবে কুরআন এবং হাদিসে উৎসাহিত করেছে, যা এগুলোকে সম্পদ এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যদি সমগ্র পৃথিবী পরিমান স্বর্ণও তাঁর বিনিময়ে দেওয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের তাওবাহ কবুল করা হবেনা। [সূরা আলে ইমরানঃ ৯১]

সোনা-রূপার গুরুত্ব জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছেছে, যেখানে তা জান্নাতীদের ভূষণ হবে। এভাবেই সোনা ও রুপা সময়ের সাথে মানুষের হৃদয়ে চূড়ান্ত সংরক্ষিত মূল্যমান হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রভাব ফেলে। দিনার এবং দিরহাম পণ্য এবং সেবার বিপরীতে পরিমাপ এবং লেনদেনের আদর্শ একক হিসেবে স্থান ধরে রাখে। তাছাড়া ইসলাম এইসকল লেনদেনসমূহকে ধোঁকা, প্রতারণা এবং জালিয়াতি থেকে রক্ষা করে। বিশেষ করে মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জুলম থেকে যা হচ্ছে – আর রিবা অর্থাৎ সুদ। বস্তুত, সুদ এতই ঘৃণিত যে, যারা এর লেনদেন থেকে নিজেদের বিরত রাখেনা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর তোমরা যদি তা (সুদ) পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। [সূরা বাকারাহঃ ২৭৯]

আর এভাবেই সুদের শিকলে আঘাত করে ইসলামের সোনালী যুগে বারাকাহ ফিরে আসে। শুধুমাত্র নামে যাকাত ছাড়া সম্পূর্ণ করমুক্ত ব্যবসা-বানিজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ লাভের সাথে ৭৭ হিজরীতে আমিরুল মু'মিনীন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালীন মুদ্রাসমূহ হতে সকল প্রকার শিরকী চিহ্ন এবং হারাম চিত্রসমূহকে মুছে ফেলেন এবং প্রথমবারের মত দিনার প্রস্তুত করার আদেশ প্রদান করেন। তাছাড়া খলিফাহ মুদ্রা সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এর বিশুদ্ধতা এবং ওজনের সুরক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

যেভাবে আল্লাহ আদেশ করেন, "মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম, এর পরিণাম শুভ। [সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৩৫]

আর একারনেই মুমিনগণ মাপ পূর্ণ করেন এবং সোনার দিনার চাঁছা হতে নিজেদের বিরত রাখেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং তা জ্ঞানের ফোয়ারা বাগদাদ হতে ইউরোপের ভূমি নয়নাভিরাম আন্দালুস (স্পেন) বিজয়ের মাধ্যমে উপনিবেশ স্থাপন করে। আন্দালুস ইসলামের ছায়াতলে এসে সুদমুক্ত হয়, সোনার দিনার ও রুপার দিরহামে মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে করমুক্ত ব্যবসা-বানিজ্যে উন্নতি লাভ করে। কিন্তু যখন আন্দালুস ইসলামের আলোয় আলোকিত ছিল, তখন বাকি ইউরোপ ছিল কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত, কলহে আপতিত, লভ-লালসা ও অশ্লীলতায় আক্রান্ত। রাজ্যসমূহ সবাই নিজেদের আলাদা মুদ্রা ব্যবহার করত, যা এক মুদ্রাকে অপর মুদ্রায় বিনিময় করা এবং এই সেবার জন্য দাম চাওয়ার ব্যবসাকে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করে। তাছাড়া ব্যাংকাররা সোনা এবং রুপার মুদ্রার দিকে আকৃষ্ট করতে তাদের ভাণ্ডারে মজুদকৃত মুদ্রার উপর সুদ প্রদান করতে থাকে। অতঃপর, ব্যাংকাররা উপলব্ধি করল সকল জমাকারী একসাথে তাদের সোনা এবং রুপার মুদ্রা উত্তোলন করছেনা, যা দুর্নীতির পরবর্তী ধাপকে সংকেত দেয়। এটি "ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং" নামে পরিচিত হয়। যার ব্যাখ্যা হল- একজন ব্যক্তি ব্যাংকে ২০টি স্বর্ণমুদ্রা জমা করে এই শর্তে যে, সে জমাকৃত মুদ্রার উপর প্রতি মাসে একটি স্বর্ণমুদ্রা সুদ হিসেবে পাবে। যদি আরও ৪জন ব্যক্তি একই কাজ করেন, তাহলে ব্যাংকের ভাণ্ডারে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা জমা হবে। কিন্তু ওই একটি স্বর্ণমুদ্রা সুদসহ তার জমাকৃত স্বর্ণ নিতে সকলে একসাথে আসেনা। যদি একজন আসে, তাহলে সে তার মজুদকৃত স্বর্ণমুদ্রা এবং সুদসহ ২১টি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যায়। তার ওই সুদের একটি স্বর্ণমুদ্রা কিন্তু ব্যাংক নিজের থেকে দেয়না। ব্যাংকের কাছে জমাকৃত ১০০ থেকেই ২১টি দেয়। ফলে ব্যাংকে আর জমা থাকে ৭৯টি স্বর্ণমুদ্রা। বাকি ৪জন তাদের ডিপোজিট থেকে স্বর্ণমুদ্রা একসাথে উত্তোলন করবেনা এই আশায় ব্যাংক তাদের কাস্টমারদের ডিপোজিট থেকে একটি অংশ (ধরা যাক ২০টি) ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারে এই শর্তে যে, ঋণ পরিশোধের সময় তারা ২টি করে স্বর্ণমুদ্রা সুদ হিসেবে দিবে। ব্যাংক এখানে এমন সম্পদ ব্যবহার করে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে

যা তাদের নয়, তাদের কাস্টমারদের। আর এই পদ্ধতির অনুসরণ করে আজ "ব্যাংক নোট" নামক কাগজের উত্তানের ঘটেছে। প্রথমদিকে মানুষেরা সুদ লাভের জন্য সোনা ও রুপা জমা করার জন্য একটি রশিদ বা প্রমিটরি নোট গ্রহণ করত, যেখানে বহনকারীর জন্য সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখ থাকত। এই নোট বহনকারীকে নিছক এতে উল্লেখকৃত মোট সম্পদ মুদ্রা হিসেবে পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি বহন করে। আসল সম্পদ সোনা এবং রূপার মধ্যে বিদ্যমান, নোটের মধ্যে নয়। এই ব্যাংক ব্যবসা এতটাই লাভজনক হয়ে দাড়ায় যে, বিদেশী বণিকদের সাথে ব্যবসা করার জন্য বহুজাতিক শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভেনিস থেকে লন্ডন পর্যন্ত। লন্ডনে প্রথম রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নামকরণ করা হয় "ব্যাংক অব ইংল্যান্ড"। কিন্তু তা ইংরেজ সরকারের ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত ছিল। ফলে এটি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করে এবং কাগজের নোটের ব্যবহারকে বলপ্রয়োগ করে আরোপ করে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে ব্যবহার করে ইউরোপ জুড়ে এই জুলুমবাজ তন্ত্র বেড়ে উঠে এবং দ্রুত বিস্তার লাভ করে। প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাপক বিরোধিতার পর ১৩৩২ হিজরী (১৯১৩ সালে) এই ব্যবস্থার নকল করে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় "দ্যা ফ্যাডারেল রিজার্ভ"।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে নকল করে এটিও ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্পোরেশন এবং সরকারের প্রতি এক বিশেষ ব্যাংকার, যাকে চাহিদা অনুসারে স্বর্ণমানে পূরণীয় ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট ছাপানোর ক্ষমতা দেয়া হয়। অর্থাৎ, স্বর্ণমানের সাথে এই নোটের সংযোগের ফলে এই জালিয়াতি নোট কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা পায়। ফ্যাডারেল রিজার্ভ এর প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে জাতিসমুহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে। ব্রিটেন তার পুরনো দালাল রাফিদা শিয়াদের (ইরান) সহায়তায় ইরাকে প্রবেশ করে। তারা মুসলিমদের ভূমি এবং এর তেল যুদ্ধলব্দ সম্পত্তি হিসেবে দখল করে। সাইক্স-পিকো চুক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রুসেডাররা মুসলিমদের ভূমিসমূহকে ভেঙ্গে ছোট ছোট জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করে এবং ইহুদীদের জন্য তাদের নিজেদের রাষ্ট্র বরাদ্দ করা হয়। একটি রাষ্ট্র (ইসরাঈল) যা অসংখ্য মুসলিমদের হত্যাযজ্ঞের উপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত এবং নব্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী দালাল আরব ত্বগুতদের দ্বারা সুরক্ষিত। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আমেরিকা লড়াইয়ের বাহিরে থাকে, যা তাদের অর্থনীতিকে পাকাপোক্ত করে অস্ত্র উৎপাদন এবং আটলান্টিক হয়ে ইউরোপে তা সরবরাহ করার মাধ্যমে। আমেরিকান

শ্রমিকদের ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট নামক এক টুকরো কাগজ দিয়ে বেতন প্রদান করা হত। এবং ইউরোপ থেকে প্রদেয় গ্রহণ করা হত সম্পদের প্রকৃত একক সোনা দ্বারা। যুদ্ধের ব্যয় বহনের জন্য ইউরোপের ত্বগুতরা তাদের স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে এবং এভাবে তারা নোটসমূহের স্বর্ণ নির্ভরতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। যেহেতু নোটসমূহের আর কোন স্বর্ণ নির্ভরতা রইল না, তাই সরকারগুলো বেশি করে নোট ছাপাতে থাকল। জার্মানিতে ব্যাংক নোটের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। যখন রাষ্ট্রসমূহ পণ্যদ্রব্য এবং সেবার চাহিদা বিবেচনা না করে নোট ছাপাতে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। জার্মানিতে যুদ্ধের শুরুতে যে রুটির দাম ১০০ মার্ক ছিল, যুদ্ধের শেষে তা ২ বিলিয়ন হয়ে যায়...!!! ফলে জার্মানির জনগণ ত্বগুতদের কাছে শুধু তাদের স্বর্ণই হারায়নি, বরং তারা তাদের সঞ্চয়ও হারায়। কারন মার্ক অর্থহীন কাগজের টুকরো হয়ে দাড়ায়, যা রাস্তায় স্তূপাকারে পড়ে থাকত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকাও দেশীয় পর্যায়ে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাদের সকল সোনা হস্তান্তরের আদেশ করে। এরপর ফ্যাডারেল রিজার্ভ নতুন বিল ছাপায় এবং তা থেকে "স্বর্ণমানে পূরণীয়" শব্দটি উঠিয়ে নেয়। এখন দেশীয় পর্যায়ে একটি ফ্যাডারেল নোট শুধু মাত্র অন্য একটি ফ্যাডারেল নোট দ্বারা পূরণীয়। সোনাকে বাইরে রেখে ব্যাংক নোট সকল প্রকার পণ্যদ্রব্য এবং সেবার প্রাথমিক পরিমাপক হয়ে যায়। ব্যাংকাররা অবশেষে সফলতার সাথে সোনাকে প্রতিস্থাপন করে, যাকে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত পরিমাণ হিসেবে তৈরি করেছেন। সোনা, যা সত্যিকারের সম্পত্তি, যাকে গলিয়ে মুদ্রায় পরিণত করার আগে ভূমির অভ্যন্তর থেকে বের করা হয়। তা এক টুকরো কাগজ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যা পৃথিবীব্যাপী ত্বগুতদের বিচক্ষণতায় জনগণের উপর বল প্রয়োগ করে আরোপিত হয়েছে। এই মহা জোচ্চুরির কিছু সময় পরেই পৃথিবী ২য় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে কম্পিত হয়। যুদ্ধরত জাতিসমুহ আরও একবার সম্পূর্ণ যুদ্ধব্যাপী তাদের স্বর্ণ সরবরাহসমূহ সম্পূর্ণরুপে ব্যয় করে ফেলে। কিন্তু আমেরিকা এইবারও তাদের পূর্বের কৌশলের মতো প্রথম দিকে লড়াইয়ের বাহিরে থাকে। স্বর্ণের বিনিময়ে যুদ্ধোপকরণ, খাবার এবং অন্যান্য উপকরণ বিক্রি করে দুই বিশ্বযুদ্ধের বদৌলতে সোনার বিশাল প্রবাহের সাথে স্বর্ণের বাজেয়াপ্তকরন, দুই মিলে আমেরিকা এখন পৃথিবীর মোট সোনার একটি বড় অংশের অধিকারী। এই

শক্তিশালী অবস্থানে থেকে আমেরিকা ব্রিটন উডসে ৪০টি দেশকে সাথে নিয়ে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এক নতুন ব্যাংকিং এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে, যার নামকরণ করা হয় – "ব্রিটন উডস পদ্ধতি"।

এই নতুন পদ্ধতি অনুসারে ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট (এক আউন্স=৩৫ ডলার) এই স্থায়ী দরে সোনার বিপরীতে পূরণীয় হবে এবং বাকি দেশগুলো তাদের নোটগুলোকে ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোটের সাথে সম্পর্কযুক্ত করবে। ফলে ফ্যাডারেল রিজার্ভ পৃথিবীর সকল জাতিসমূহের ব্যাংকারে পরিণত হয়। অতঃপর, এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্য করার জন্য সকল দেশকে ডলার জমা করে মজুদ করতে হবে। আর কিভাবে তারা ডলার জমা করবে...?

আমেরিকাকে তাদের রপ্তানিকৃত দ্রব কিংবা সোনা দিতে হবে। আর বিনিময়ে ফ্যাডারেল রিজার্ভকে যা করতে হবে তা হল, প্রায় মূল্যহীন কিছু কাফজের টুকরো তথা ডলার ছাপাতে হবে। ঔদ্ধত্য এবং মূল্যহীন ডলার নোটে পরিপূর্ণ হয়ে আমেরিকা এখন তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিরধারন করে। এর শুরু করে তারা কমিউনিস্ট মুশরিক রাষ্ট্র ভিয়েতনামকে দিয়ে।

ভিয়েতনামে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে ফ্যাডারেল রিজার্ভ এমন পরিমাণ নোট ছাপায় এবং আমেরিকার সরকারকে ঋণ প্রদান করে, যা তারা কক্ষনোই স্বর্ণ দ্বারা পূরণ করতে পারবেনা। বিশ্বব্যাপী জাতিসমুহ এই জালিয়াতি বুঝতে পেরে ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হওয়ার বছর তারা তাদের নিজেদের স্বর্ণমানে পরিবর্তনের অধিকার অনুশীলন করে, যা সোনার প্রবাহ আমেরিকার বাহিরে দিতে শুরু করে।

তাদের এই স্বর্ণ মজুদ ধরে রাখতে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ফ্যাডারেল রিজার্ভ একটি আত্মগৌরবপূর্ণ প্রেসিডেন্সিয়াল অধ্যাদেশ জারি করে। এবার তা প্রেসিডেন্ট নিক্সন দ্বারা অর্পিত হয়। প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এই অপকর্মটি করেন বলে একে বলে 'নিক্সন শক'। সকল স্বর্ণমানে পূরণের অধিকারকে বাতিল করে প্রেসিডেন্ট নিক্সন "ব্রিটন উডস'' পদ্ধতির অবসান ঘটায়। অর্থাৎ, প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট আর স্বর্ণ নির্ভর রইল না। এখন তা মূল্যহীন কাগজের টুকরো ছাড়া কিছুই নয় এবং ডলার আর সোনার বদলে পরিবর্তনযোগ্য রইল না। অতঃপর ফ্যাডারেল রিজার্ভের সাবেক ইহুদী চেয়ারম্যান অ্যালান

গ্রীনস্পান উদ্ধতপূর্ণ হয়ে দাবি করে; "{যুক্তরাষ্ট্র এখন যেকোনো ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। কারন আমরা এখন তা করতে ডলার ছাপাতে পারব। অতঃপর "ডিফল্ট প্রবাবিলিটি" (DP) শূন্য"}।

বস্তুত এই নিক্সন অধ্যাদেশ অনুসারে ফ্যাডারেল রিজার্ভ কর্তৃক চলতি বেস ডলারের পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে দাড়ায় ২.৫ ট্রিলিয়ন (২৫০ বিলিয়ন) ডলার। এই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুসারে, ফ্যাডারেল রিজার্ভ পদ্ধতির অধীনে অন্যান্য ব্যাংকসমূহ এক নতুন ধরণের ডিজিটাল ডলার তৈরি করার অনুমতি পায়, যার নাম "ব্যাংক ক্রেডিট" ঋণ চুক্তি, উদাহরণস্বরূপ মর্টগেজ (বন্ধক) এর বিপরীতে। এখন এই শয়তানি পদ্ধতির চরম পর্যায়ে তা এক প্রতারনার বিষয় প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেয় – সুদ। ফ্যাডারেল রিজার্ভ থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য আমেরিকা সরকার প্রথমে একটি বন্ড ইস্যু করে। সাধারণ ভাষায় যা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ডলার ঋণ করার এবং সুদসহ তা পরিশোধ করার চুক্তি মাত্র। ফ্যাডারেল রিজার্ভ পরবর্তীতে ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ থেকে এই বন্ডগুলো ক্রয় করে এবং এই লেনদেনের শেষে ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোটসমূহ ছাপাইকৃত হয়ে অস্তিত্বে আসে। কিন্তু ফ্যাডারেল রিজার্ভ যখন একটি বন্ডের বিপরীতে ডলার তৈরি করে অথবা ব্যাংকসমূহ যখন ঋণচুক্তির বিপরীতে ডলার তৈরি করে, তার জন্য আসলে শুধুমাত্র এই ঋণের মূলধনের পরিমাণ ডলারই তৈরি করা হয়। কিন্তু এই ঋণ সুদসহকারে পরিশোধ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে; "যদি ব্যাংকসমূহ ঋণের মাধ্যমে ডলার তৈরি করে, তাহলে এই সুদ পরিশোধ করার জন্য যে ডলার প্রয়োজন, তা কোথা থেকে আসে...???

কথা হল, এর আসল কোন অস্তিত্ব নেই। এই জালিয়াতি পদ্ধতির অধীনে, ঋণের মোট পরিমাণ – মূলধনের সাথে সুদ (সুদ-আসল) সবসময় ঋণের চেয়ে বেশিই হবে। তাই অনবরত অরিরিক্ত ডলার ধারণকৃত হয়ে অস্তিত্বে আসবে ঋণের উপর এই জুলুমের সুদ পরিশোধ করার জন্য। যেমনটি অর্থনীতি বিশ্লেষক মাইক মেলনি বর্ণনা করেন; "{যখন আপনার সম্পূর্ণ মুদ্রার সরবরাহই ঋণের উপর ভিত্তি করে, তার সাথে সুদ এবং এই সুদ পরিশোধ করার মুদ্রা এখনো অস্তিত্বেই আসেনি, এর মানে আপনাকে আরও বেশি ঋণের গভীরে যেতে হবে। এবং জনগণ যদি সর্বদা মুদ্রা সরবরাহের সময় ঋণকৃত সুদাসলকে পরিশোধ করার জন্য অধিক ঋণ গ্রহণ

না করে তাহলে পুরো বিষয়টিই সংকোচ ধ্বস (Deflationary Collapse) এর দিকে যাবে"}।

এর মানে হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি এই শয়তানী পদ্ধতির একটি স্বভাবজাত এবং অন্তহীন অংশ। কারন, এর মধ্যে ভরাট করার জন্য অনবরত নতুন ডলারের প্রয়োজন। অতঃপর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি চলতে থাকবে। বস্তুত ফ্যাডারেল রিজার্ভের অস্তিত্বে আসার সময় থেকেই ডলার এর মূল্যমান হারিয়ে ফেলেছে।

বিষয়টি আরও বোধগম্য হওয়ার জন্য উদাহরণ হল; ফ্যাডারেল রিজার্ভ এর শুরুর দিকে একটি পাউরুটির দাম ছিল ৬ সেন্ট, এখন তা ১.৫০ ডলার। এখানে মূল্যবৃদ্ধির হার ২২০০%, যেমনটি রন পল প্রদর্শন করেন। এটি একটি সুস্পষ্ট জোচ্চোরি, যা মানুষের সঞ্চয়কে ডাকাতি করে ছিনিয়ে নেয়।

রন পল বলেন, "{এখানে ডলারের একটি সঞ্চয় রয়েছে এবং মানুষের অর্থ চুরি হচ্ছে। যেসকল লোক সঞ্চয় করছেন, তারা ডাকাতির শিকার হচ্ছেন। যদি ডলারের ১০% মূল্য হ্রাস হয়, তাহলে মানুষ ১০% ডাকাতির স্বীকার হয়"}।

এখন এই বিশাল পরিমাণ ডলারের অস্তিত্বে আসার সাথে সাথে, নতুন দুটি প্রশ্নের উদয় হয়; "আমেরিকা কেন এই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব স্পষ্ট অনুভব করছেনা...???"

এবং কেন এই জালিয়াতি নোটের চাহিদা অনবরত জারি রয়েছে...??? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর এমন এক জিনিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে, যা ছাড়া কোন জাতি কার্যতভাবে পরিচালিত হতে পারেনা। আর তা হচ্ছে "তেল", যাকে আমেরিকানরা "কালো সোনা" বলে থাকে। তেল যা মোটরযান, পাওয়ার প্লান্ট এবং কারখানাগুলোতে জ্বালানী সরবরাহ করে। এটি অর্থনীতির জীবনী শক্তি। এবং এটি যুদ্ধের যন্ত্রপাতিকে জ্বালানী সরবরাহ করে তা দেশগুলোকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করে। যার দরুন তেলের চাহিদা সর্বদা প্রচুর এবং এর ফলে মার্কিন ডলারের চাহিদাও। তাই, নিক্সন অধ্যাদেশ অনুসারে আমেরিকান সরকার তাদের ত্বগুত দালাল সৌদি সরকারকে "ওপেকে" (OPEC) শক্তিশালী প্রভাব ধরে রাখার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে। "ওপেক" এমন এক সংস্থা, যার সদস্য হচ্ছে প্রধান তেল উৎপাদনকারী জাতিসমুহ, যাতে তারা তেলের মূল্য নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এবং তেল যেন শুধুমাত্র ফ্যাডারেল

রিজার্ভ ডলারের বিনিময়ে বিক্রি হয়, এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। আর এর বিনিময়ে আমেরিকা এই ত্বগুত আরব সরকারকে সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে সহায়তা করতে থাকবে। এই চুক্তি "পেট্রোল ডলার পদ্ধতি" নামে পরিচিত হয়। প্রথমত, এই পদ্ধতির মানে হচ্ছে ফ্যাডারেল রিজার্ভ দ্বারা দিকনির্দেশিত হয়ে আমেরিকা ইচ্ছামত ডলার ছাপাতে পারবে যার মূল্য ঐ ছাপার কাজে ব্যবহৃত কাগজের মুল্যের চেয়ে বেশি নয়, যাতে তেল ক্রয় করা যায়। যা ত্বগুতরা মুসলিমদের কাছ থেকে চুরি করেছে এবং যা সোনার বিনিময়ে বিক্রি করার কথা ছিল। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এখ তেল ক্রয়ের জন্য বাকি জাতিগুলোর মার্কিন ডলার দরকার, তাই আমেরিকা এখন তাদের মুদ্রাস্ফীতি বিদেশে স্থানান্তর করতে পারবে, যেমনটি অর্থনীতি সমালোচক এডওয়ার্ড গ্রাফিন বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, "ফ্যাডারেল রিজার্ভ যে ডলার তৈরি করেছে তার একটি বড় অংশ বিদেশে স্থানান্তর করা হয়েছে। আমি আমার গবেষণার প্রথমদিকে এই কথাটি শুনতে পাই যে, আমেরিকা তার "মুদ্রাস্ফীতি রপ্তানি করছে। আমি চিন্তা করি, সেটা আবার কি? আপনি কিভাবে আপনার মুদ্রাস্ফীতি রপ্তানি করবেন? একটি বাক্সে করে পাঠিয়ে দিবেন? না হয় কি করবেন? হ্যাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি। আপনি অন্যান্য দেশের জন্য তৈরিকৃত ডলার প্রেরণের মাধ্যমে আপনার মুদ্রাস্ফীতি রপ্তানি করবেন। আর বিনিময়ে তারা আপনাকে টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি প্রেরণ করবেন। অর্থাৎ আপনি পাবেন যন্ত্রপাতি আর তারা পাবে ছোট ছোট কাগজের টুকরো।

আমেরিকানদের জন্য বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ"। এমনকি যদি দেশসমূহ ডলারের বিনিময়ে পণ্য রপ্তানী নাও করে, তবুও দেশসমূহকে ফ্যাডারেল রিজার্ভ ডলার মজুদ রাখতে হবে। তেল আমদানি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য। এর মানে ডলারগুলো আমেরিকার বাহিরেরি থেকে যাবে। তৃতীয়ত, এই পেট্রো ডলার পদ্ধতি আমেরিকাকে অনবরত তাদের আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করতে সাহায্য করেছে। বিস্তারিত বলতে গেলে, ২০১৪ সালে আমেরিকার বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ডলার, আর ব্যয় হল ৩.৫ মিলিয়ন ডলার, পার্থক্য ৫০০ বিলিয়ন ডলার...!!!

অতঃপর এই বিশাল পার্থক্যকে পরিশোধ করতে আমেরিকার অতিরিক্ত যে ডলার দরকার তা ঋণ নিতে বন্ড ইস্যু করে। একে বলে ব্যয় ঘাটতি। তাহলে আমেরিকা

কিভাবে এই ব্যয় ঘাটতির সাথে এক বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে টিকে আছে...???

আবারো উত্তর লুকিয়ে আছে পেট্রো ডলার পদ্ধতির মধ্যে। পেট্রো ডলার পদ্ধতি মার্কিন ডলারের প্রচুর চাহিদা পূরণ করেছে। যা মার্কিন বণ্ডকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এই সুবিধার তাৎপর্য বুঝার জন্য উদাহরণ হল, মার্কিন ডলারের বিনিময়ে চীন আমেরিকার কাছে রপ্তানী পণ্য প্রেরণ করে, যা চীনের ডলার রিজার্ভে জমা হতে থাকে। কিন্তু এই ডলারকে পড়ে থাকতে না দিয়ে চীন এই ডলারের একটি বড় অংশ দিয়ে মার্কিন বন্ড ক্রয় করে যা সুদ প্রদান করে। অতঃপর ডলার আবার আমেরিকায় ফিরে আসে। আমেরিকা আবার একই ডলার ব্যবহার করে আরও দ্রব্য আমদানি করে।

অর্থাৎ সবশেষে, ডলারের একটি বড় অংশ আমেরিকার বাহিরেই থেকে যায়। এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব উপলব্দি না করে আমেরিকা সর্বদা তার আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় চালিয়ে যেতে পারে। একটি বড় বক্রাঘাত হল, পেট্রো ডলার পদ্ধতির অধীনে সৌদি এবং অন্যান্য আরও দালাল সরকারসমূহ যারা ইতিমধ্যে তেলের মালিক, তাদের এই তেল থেকে প্রাপ্ত রাজস্বে বড় একটি অংশ আবার মার্কিন বন্ড ক্রয় করার জন্য ব্যবহার করতে হয়। যা সুদ প্রদান করে, যা আমেরিকাকে এই ডলারসমূহ আবার নতুন আমদানি বা সামরিক সামর্থ্য অর্জনের জন্য পুনরায় ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করে।

বস্তুত, আমেরিকার এই বন্ডসমূহের বড় অংশ পৃথিবীর এমন সব জাতিসমূহের দখলে তা দুশ্চিন্তার বিষয়। চীন একাই ১২৬৩ বিলিয়ন, জাপান ১২১০ বিলিয়ন, ব্রাজিল ২৪৬ বিলিয়ন, যুক্তরাজ্য ১৮৫ বিলিয়ন, তেল রপ্তানিকারকরা ২৫৫ বিলিয়ন ও অন্যান্য। কিন্তু এই পেট্রো ডলার পদ্ধতি, যা আমেরিকার বণ্ড মার্কেটকে টিকিয়ে রাখতে এবং ত্বগুতদেরকে মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে সহায়তা করে।

আবার এটাই তাদের চরম দুর্বলতা। এখানে যখন তারা আঘাতপ্রাপ্ত হবে, তখন তাদের জুলুমের এই ব্যাংক নোটের মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসবে। অন্যায় আর জুলুমের প্রতীক আমেরিকাকে অবনমিত করবে। কারন এই পদ্ধতি জুলুমবাজ ব্যাংক হতে জন্ম নিয়েছে এবং সুদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐ দেশ সমেত যা এর পৃষ্ঠপোষকতা করে একই সুদ ভিত্তিক বুনিয়াদের উপর ধ্বংস হবে

যার উপর ভর করে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আমেরিকার অর্থনীতিতে দুটি প্রকাশ্য দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, যদি এই পদ্ধতির ব্যাংক ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য অবিরাম ডলার সরবরাহ না করা হয়, তাহলে এই সম্পূর্ণ জালিয়াতি পদ্ধতি নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, চলমান ভু-রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের প্রধান জাতিগুলো রাশিয়া এবং চীনের নেতৃত্বে পরিচালিত।

তারা ইতিমধ্যেই মার্কিন বন্ড মার্কেট ও পেট্রো ডলার পদ্ধতির উপর আঘাত হানার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য প্রদর্শন করেছে, সহজেই মার্কিন ডলার ডাম্পিং এর মাধ্যমে যেমনটি অর্থনীতি বিশ্লেষক জিম রিকার্ডস উল্লেখ করেন, "{আমেরিকার ঋণের একটি বড় অংশ বিদেশীদের মালিকানাধীন। তারা কারা? চীন, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশসমূহ যারা আসলে আমাদের বন্ধু দেশ নয়। কিন্তু তারা যখন চায় তখনই ডাম্প করতে পারে। হ্যাঁ, চিন্তা করুন, আসলে তাই হচ্ছে। সাম্প্রতিক মার্কিন বন্ডে "ফরেইন হোল্ডিং" পড়তে শুরু করেছে। এদিকে রাশিয়া মাসের পর মাস ট্রেজারি ডাম্প করছে। সেটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতির পরিষ্কার সংকেত"}।

যখন জাতিসমূহ মার্কিন বন্ড ডাম্পিং শুরু করবে, সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করার আসল ফলাফল তখন অনুভুত হবে। জিম রিকার্ডস আরও বলেন, "{এখন বিদেশীরা ট্রেজারি ডাম্প করছে এবং যদি কেউ তা না কিনে, ভেবে দেখুন, সুদের হার বেড়ে যাবে। তারা স্টক মার্কেট, হাউজিং মার্কেট ডুবিয়ে দিবে। উচ্চ সুদের হার মানে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি। অতঃপর সুদের হার যদি আরও একটু বৃদ্ধি পায়, তাহলে আপনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই"}।

আর যখন "পেট্রো ডলার" পদ্ধতি ধ্বংস হবে এবং দেশসমূহ তাদের রিজার্ভ থেকে ডলার ফেরত দিতে শুরু করবে, তখন মার্কিন ডলারের মূল্যমানও পড়ে যাবে। যেমনটি অর্থনীতি বিশ্লেষক গ্রাফিন গুরুত্ব আরোপ করেন, "{যখন সময় আসবে, যতটুকু মনে হচ্ছে তা এখনই আসছে, যখন বাকি পৃথিবী বলছে, "উহ, আহ, আমরা আর এই খেলা খেলতে চাইনা"। তখন ডলারসমূহ আমেরিকায় ফিরে আসবে। জনগণ ভাববে, "আমরা এইগুলো আর চাইনা, এগুলো দিয়ে আমরা কি করব?" একবার এই চক্র শুরু হল এবং আমরা পূর্বে রপ্তানিকৃত আমাদের অর্থ

ধীরে ধীরে ফিরে পেতে শুরু করলাম। কিন্তু যখন তা একটি প্লাবনে পরিণত হবে এবং তা দ্রুত ফিরে আসতে শুরু করবে, তখন আমরা আমাদের পূর্বের রপ্তানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি ফিরে পাচ্ছি। এবং তারপর আমরা দেখব যুক্তরাষ্ট্রে অর্থের পরিমাণ এর দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে যে, ফ্যাডারেল রিজার্ভ তা আর তৈরি করতে পারবেনা। কারন আমরা আমাদের পূর্বের অর্থ ফিরে পাচ্ছি। তখন আমরা আমেরিকা কি আমদানি করবে এর অনুসারে বাস্তবে মার্কিন ডলারের পতন দেখতে পাব"}।

একই সাথে, অন্যান্য ত্বগুত রাষ্ট্রগুলোও অতি দ্রুত সরে যেতে পারবেনা। কারন তারাও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজেদের জালিয়াতির নোট ছাপিয়ে ফায়দা হাসিল করেছে। অতঃপর তারা একটি অপেক্ষার খেলা খেলে ভু-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ট্রিগার যা ডলারের চূড়ান্ত পতন নিয়ে আসবে, তা চেপে ধরে সোনা ফেরত নেয়া এবং মজুদ করার মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যা কিনা পৃথিবীর একমাত্র প্রকৃত সম্পদের মানদণ্ড এবং বিনিময়ের মাধ্যম।

কাগজের নোটের আরও কিছু সমস্যা আছে। তা ভিজে যায়, ছিঁড়ে যায়, পুড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু স্বর্ণ, রুপা, তামা তা হয়না। বুঝতেই পারছেন, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বাটপাররাই আজ দুনিয়ার নিয়ন্ত্রক। এই বাটপাররাই আমাদের মানবাধিকার শিখায়, সততা শিখায়, সন্ত্রাসবাদ শিখায়। অথচ আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখতে পারেনা। আর আমি, আপনি সবাই ইনডিরেক্টলি ইরাক, আফগানিস্তান, ইসরাইল সব জায়গায় যুদ্ধের খরচ আমেরিকাকে যুগিয়ে যাচ্ছি ডলার ব্যবহার করে। আমরা যতই বলিনা কেন, অমুক আমেরিকার সৃষ্টি, তমুক ইসরাইলের সৃষ্টি, কিন্তু আমরাই খ্রিস্টানদের তৈরি গণতন্ত্র গিলে ফেলেছি, ইহুদীদের সুদের কারবার ব্যবস্থা খেয়ে নিয়েছি। আবার আমেরিকা, ইসরাইলের বিরোধিতা করছি।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে বলে দিয়েছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে- তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করা হবে। যেমনটি তিনি কর্তৃত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি তাদের জন্য যে দ্বীনকে পছন্দ করেছেন সেটাকে অবশ্যই মজবুত ভিত্তিতে সুদৃঢ় করবেন। তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত করে দেবেন যাতে তারা কেবল আমারই এবাদত করে এবং আমার সাথে

কাউকে শরিক না করে। এরপর যারা (এ বিশাল নেয়ামতকে) অস্বীকার করবে, তারাই ফাসেক ও অবাধ্য।" [সূরা নুরঃ ৫৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন – "আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাহকে বৃদ্ধি করেন। [সূরা বাকারাহঃ ২৭৬]

সুতরাং, আল্লাহ পরাক্রমশালী তাঁর সত্যবাদী এবং শিরকবিহীন ইবাদতকারী বান্দাদের জমিনে ক্ষমতা দানের মাধ্যমে জমিনকে পবিত্র করবেন এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়ের রাজ্য বানাবেন। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা'আলার মুয়াহহীদ বান্দাগণ সুদকে ধ্বংস করার এবং স্বর্ণমুদ্রা ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন, দিনার ও দিরহামের সুন্নাহকে প্রত্যাবর্তন অরেছেন। "আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করবেনই, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে"। [আস সফঃ ৮] "তোম

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮০৬৮

আল-কায়েদা দ্বীন কায়েমের মিশন, শুধু জিহাদি সংগঠন নয়!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-২০-২০১৭

আল-কায়েদার কর্যক্রম শুধু জিহাদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, আল-কায়েদা কেবল একটা জিহাদি সংগঠনই নয়; বরং আল-কায়েদার টার্গেট পূর্ণ দ্বীন কায়েম করা। কুফর-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে শরীয়া-ভিত্তিক শাসন কায়েম করা। খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সমাজের প্রতিটি স্তর, প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোয় আলোকিত করা। দুনিয়ামুখী মানুষদের আখেরাতমুখী করা। আল্লাহ-ভুলা বান্দাকে আল্লাহর দিকে টেনে নেয়া।

এ কারণেই আপনারা দেখতে পাবেন, যে কেউ আল-কায়েদার সদস্য হতে চাইলেই আল-কায়েদা তাকে সদস্য বানায় না, যতক্ষণ না তাকে একজন দ্বীনদার ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলে। একজন মানুষের যথাসাধ্য ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধি করে একজন দ্বীনদার ও দ্বীনপ্রেমী ব্যক্তিতে পরিণত করার পরই কেবল তাকে সদস্য বানায়।

অধিকন্তু আল-কায়েদা সদস্য বানায় কমসংখ্যক ব্যক্তিকেই, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরেই তার ইসলাহী কার্যক্রম পরিচালনা করে। কারণ, আল-কায়েদার উদ্দেশ্য শুধু কিছু ব্যক্তিকে সদস্য বানিয়ে তাদের দিয়ে যুদ্ধ করে ক্ষমতা দখল করত ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করা নয়, বরং তার উদ্দেশ্য গোটা সমাজ ও সমাজের মানুষকেই পরিশুদ্ধ করে দ্বীনদার ও দ্বীনপ্রেমী বানানো। কাজেই, আল-কায়েদা যেমন একটি জিহাদি সংগঠন, তেমনি একটি ইসলাহী মিশন। বিষয়টি ভালভাবে মনে রাখা চাই। এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার না হওয়া চাই। যারা আল-কায়েদার সদস্য বা সমর্থক, তাদের উচিৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজন ও

অধিনস্থদের দ্বীনের উপর উঠানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এমনটি যেন না হয় যে, জিহাদের কথা বলে বলে বাকি সব ভুলে যাই। যেন মনে না করি- জিহাদ পেয়ে গেছি আর কিছুর দরকার নেই। নিজের মাঝেও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করুন, সমাজ বদলানোর চেষ্টায়ও নিয়োজিত থাকুন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮২০৮

প্রিয় ভাইয়েরা একটু সাহায্যের প্রয়োজন।

asadhasan

Senior Member

১২-২১-২০১৭

প্রিয় ভাইগণ!!!

একটু সাহায্যের প্রয়োজন।

তা হল, নফিরে আম সম্পর্কে কিভাবে বিস্তারিত জানতে

জানতে পারি???

যদি কোন ভাই এসম্পর্কে কোন ভিডিয় বা অডিও বা বইয়ের কোন খোঁজ দিতেন তবে অনেক উপকার হত।

Ahmad Al-hindi

Member

১২-২৩-২০১৭

অনেক দিন আগে এ ব্যাপারে ছোট একটা লেখা দিয়েছিলাম। সেটা হয়তো আপনার কাজে আসতে পারে-

‘নফিরে আম’ কি খলিফাতুল মুসলিমিনের আদেশের নাম ?

আমরা জানি, ‘নফিরে আম’ হলে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। কিন্তু ‘নফিরে আম’ কাকে বলে ?

অনেকে মনে করেন-(খলিফাতুল মুসলিমিন কর্তৃক সকল মুসলমানকে জিহাদে বের হয়ে যাওয়ার আদেশকে ‘নফিরে আম’ বলে।)

এই ধারণা সহিহ নয়। বরং 'নফিরে আম' হচ্ছে একটি বিশেষ হালত(তথা অবস্থা)-এর নাম যার সাথে ইমামের আদেশের কোন সম্পর্ক নেই । আর তা হচ্ছে, কোন মুসলিম ভূখণ্ডে কাফেররা আক্রমন করে বসা এবং সকল মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত তাদেরকে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বের করা করা সম্ভব না হওয়া ।

'নফির' অর্থ- জিহাদে বের হওয়া, আর 'আম' অর্থ-ব্যাপক।

'নফিরে আম' অর্থ- এমন অবস্থা যখন সকল মুসলমানকে ব্যাপকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

যখন কোন মুসলিম ভূখণ্ডে কাফেররা আক্রমন করে বসে তখন কাফেরদেরকে ঐ মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বের করে দেয়ার জন্য 'নফির' তথা জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। এই অবস্থায় কাফেরদেরকে ঐ মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বের করার জন্য যদি ঐ এলাকার সকল মুসলমানকে জিহাদে বের হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে ঐ এলাকার সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ইমাম আছে কি নাই, বা থাকলে অনুমতি দিলো কি দিলো না - তা দেখার বিষয় নয়। ইমাম থাকুক বা না থাকুক, অনুমতি দিক বা না দিক - সর্বাবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন। (দেখুনঃ শরহুস সিয়ারিল কবীর লিল ঈমামিস সারাখসী; খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৮)

ঐ এলাকার মুসলমানগন কাফেরদেরকে বের করতে না পারলে বা অলসতা বশত জিহাদ না করলে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর এবং ক্রমান্বয়ে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, সারা দুনিয়ার সকল মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত কাফেরদেরকে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বের করা সম্ভব নয়, তাহলে সারা দুনিয়ার সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। এই অবস্থাকেই 'নফিরে আম' বলে।

আল্লামা হাছকাফি(রহ.) বলেন-

)وَفَرْضُ عَيْنٍ إِنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ فَيَخْرُجُ الْكُلُّ (

(যদি দুশমন - মুসলিম ভূখণ্ডে - ঢুকে পড়ে তাহলে - জিহাদ - ফরজে আইন, কাজেই তখন সকলেই বের হয়ে পড়বে।) (আদ দুররুল মুখতার, পৃষ্ঠা - ৩২৯)

আল্লামা শামী (রহ.) এর ব্যখ্যায় বলেন ,

(وَهَذِهِ الْحَالَةُ تُسَمَّى "النَّفِيرُ الْعَامُّ". قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ: وَالنَّفِيرُ الْعَامُّ : أَنْ يُحْتَاجَ إلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

(আর এই অবস্থাকেই 'নফিরে আম' বলা হয়। 'আল-ইখতিয়ার' কিতাবে বলেন, 'নফিরে আম' হচ্ছে সকল মুসলমানেরই - জিহাদে বের হয়ে যাওয়ার - প্রয়োজন পড়া।) (ফাতাওয়া শামী; খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৭)

অতএব, 'নফিরে আম' খলিফাতুল মুসলিমিনের আদেশের নাম নয়, বরং ঐ বিশেষ হালত(তথা অবস্থা)-এর নাম যখন সকল মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত কাফেরদেরকে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বের করা সম্ভব নয়।

বর্তমানে 'নফিরে আম'- এর হালত চলছে। বর্তমানে প্রায় সবগুলো মুসলিম ভূমি কাফের-মুরতাদদের দখলে। হয়তো কাফেররা সরাসরি সেগুলো দখল করে নিয়েছে (যেমন- স্পেন,ভারত,আরাকান,পূর্ব তর্কীস্তান...) নতুবা তাদের হাতে গড়া এবং তাদেরই এজেনডা বাস্তবায়নকারী মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে(যেমন- অধিকাংশ মুসলিম দেশের অবস্থা)।

কাজেই বর্তমানে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন। আর এই ফরজ বহাল থাকবে যতদিন পর্যন্ত না এই কাফের-মুরতাদদেরকে হটিয়ে এবং এই কুফরি শাসন ব্যবস্থাকে দূর করে ইসলামী শাসন কায়েম করা যায়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৫১২

বিশ্বব্যাপী জিহাদি ফ্রন্টগুলোতে চলমান অস্থিরতাঃ

কিছু মতামত ও কিছু প্রস্তাবনা!

আবু আব্দুল্লাহ

Moderator

১০-৩০-২০১৭

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন। আম্মা বাদ-

এক

২০১৪ সালের জুন মাসে ইরাক সিরিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে খিলাফত ঘোষণা করে আইএস, ২০১৭ সালে এসে পতনের মুখে তাদের খিলাফত। আর খিলাফত ঘোষণারও আগ থেকে জাবহাতুন নুসরাহর সাথে বিরোধের সুত্র ধরে ইরাক ও শামে এক মরুঝড় বইয়ে গেছে, যা মুসলিম উম্মাহকে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার বিষয়টিকে আরও ঘোলাতে করে দিয়ে গেছে। ইরাকের সাথে জাবহাতুন নুসরাহর সুত্র ধরে সেই যে বিরোধ শুরু হয়েছে, তা কমেনি বরং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রুপ নিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জিহাদি ফ্রন্টগুলোতে তা বিস্তৃত হয়েছে। জিহাদের দাবীদারদের মাঝে পরস্পর যে পরিমাণ লড়াই হয়েছে, তার সিকিভাগও যদি প্রকাশ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে হত, তাহলে বিশ্বের ইতিহাস এখন একটু অন্যরকম হত। যদি জিহাদের ফ্রন্টগুলো আলাদা আলাদা নেতৃত্বে ভাগ না হয়ে ইমারতে ইসলামীর অধিনে চলে আসতো, তাহলে পৃথিবীর চিত্র ভিন্ন রকম হত।

যদি শামের তানজিমগুলো "লাওমাতা লা-ইম" এর পরওয়া না করতো, তাহলে আকসার পথে কালোপতাকাবাহী দলের অগ্রযাত্রা আরও এগিয়ে যেতো! যদি আলজেরিয়া ও নাইজেরিয়ার তানজিমগুলো একটু ভেবে চিন্তে আগাত, তাহলে আজকের জিহাদি ফ্রন্টগুলোর চিত্র ভিন্ন রকম হত।

দুই

সম্মানিত পাঠক! পুরনো এই গল্পগুলো বারবার সামনে আনা স্রেফ উদ্দেশ্য নয়,

আপনি যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন, জানতে পারবেন জিহাদি ফ্রন্টগুলোতে এই অস্থিরতার মুল কারণ কি? আপনি চিন্তা করুন! হাজার হাজার যুবক ইরাক সিরিয়ায় হিজরত করেছে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের ভালোবাসা ত্যাগ করে "সাহারা মরুভুমি" পাড়ি দেওয়ার সাহস করেছে, সে কি নিজের জানা মতে একটি ভুলের উপর আঁকরে থাকবে?

একজন যুবক শাহাদাতের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বের হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর ওয়া ইসলামাহ ডাকে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, সে কিভাবে অপর একজন মুসলিম ভাইকেই হত্যা করতে চাইতে পারে?

শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত গ্রুপগুলোর বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন, প্রত্যেকটা গ্রুপে দুটি ভাগ হয়ে গেছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, সিরিয়া, ইরাক, রাশিয়া, ইয়েমেন, আফ্রিকা, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া ও সোমালিয়া সহ অনেক ফ্রন্টে খিলাফত ইস্যুতে মুজাহিদিন দুই ভাগ হয়ে গেছে!

পাঠক! আপনি-ই বলুন! ইসলামে খিলাফত ব্যবস্থার স্বরূপ কি শাখাগত বিভিন্ন মাসায়েলের ন্যায় অস্পষ্ট যে, তাতে ফুকাহায়ে কেরাম বিরোধ করেছেন? খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম ইখতেলাফ করেছেন? তাহলে কেন জিহাদি ফ্রন্টগুলোতে খিলাফত ইস্যুতে দুই ভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে?

কেন বাগদাদি ও আদনানি আমীরের আনুগত্য অস্বীকার করেছেন, কেন বাইয়াত ও অঙ্গীকারকে ওয়াজিব থেকে মুস্তাহাবে নিয়ে এসেছেন? কেন তার পরবর্তীরা একই পথে হেঁটেছেন? কেন টিটিপি বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন? কেন আবু বকর শিকাউ পূর্বসূরিদের তিলে তিলে গড়ে তোলা জিহাদি আন্দোলনকে খোদ নাইজেরিয়ার মুসলমানদের জন্য আতঙ্কের বিষয়ে বানিয়ে তুললেন? কেন শক্তি কম হওয়া সত্ত্বেও আনসার বাইতুল মাকদিস ও জামাআত জুনদুল ইসলাম মিসর ও সিনাই উপত্যকায় ভাগ হয়ে পড়েছে? কেন আহরার আশ শাম কালো পতাকা, সর্বশেষ সাদা পতাকা ছেড়ে দিয়ে জাতীয়তাবাদের ছাপযুক্ত রঙ্গিন পতাকা গ্রহণ করেছে? জিহাদ, খিলাফত, ইমামত, ইমারত, বাইয়াত, আনুগত্য ইত্যাদি কি

শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর বিবাধে, বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন?

কেন যারা বিচ্ছিন্ন হতে চান, চাইছেন বা হয়ে গেছেন, তারা জানেন না যে আমীরের প্রতি আনুগত্যের শপধ নেওয়ার পর থেকে কুফুরি প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আনুগত্য জরুরী? আমীরের বৈধ নির্দেশের অবাধ্যতা করে কোন সংগঠন ও ব্যক্তি কি সফলতায় পৌঁছাতে পেরেছে? আমাদের রব যিনি আমীরের আনুগত্য ফরজ করেছেন, তিনি তাঁর অবাধ্যতায় কোন সংগঠনকে সফলতা দান করবেন?

পাঠক একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন এমনটি কেন হচ্ছে বা হয়েছে?

তিন

ফেসবুকে যারা জিহাদ নিয়ে লেখালেখি করেন, অথবা যারা স্রেফ জিহাদি দাবীদারদের পোস্টে নজর রাখেন, তারা নিশ্চই অবগত আছেন জিহাদি সংগঠনের সাথীরা একে অপরকে কিভাবে গালি দেয়! আমি সবার কথা বলছি না, শুধু আইএসের সমর্থকদের কথা বলছি না, কায়েদাতুল জিহাদের অনেক সমর্থক এর হালত ও মুখের জবান বখাটেদের মত। ইল্লা মাশা আল্লাহ অনেকেই সুস্থ তবিয়ত ও মেজাজের আছেন।

পাঠক! এমনটি কেন হয় যে, যাকে তাকে যখন যেভাবে পারে তাকফিরের আওতায় নিয়ে আসা হয়? কেন বিশেষত আলিমদের ক্ষেত্রে অমুক কাফের, তমুক মুরতাদ কোন বাছবিচার করা হয়না? কেন একজন ভাই অপরেকজন ভাইকে কোন চিন্তা ছাড়া-ই কাফের বা মুরতাদ বলে দেওয়া হয়? কেন বারবার একাধিক বার্তায় জিহাদের মাশায়েখগণ প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে তাকফিরের বিষয়টি আলিমদের হাতে সোপর্দ করার দায়িত্ব দেওয়ার পর-ও মুজাহিদিন অনেকে এটাতেই আনন্দ পান? কেন মুজাহিদিন জিহাদের মৌলিক বিষয়গুলো রেখে শরীয়তের শাখাগত বিষয়গুলো নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে ভালোবাসেন?

এই ধরনের আরও অনেক কেন আছে, যা আপনি জেনে থাকবেন!

আমি কয়েকজন ভাইয়ের ব্যাপারে জানি, যারা মাসুলের নির্দেশনাকে যথাযথ মূল্যায়ন করেন না! আবার অনেক মাসুলের ব্যাপারে ধারণা, যারা অধিনস্ত

ভাইদের প্রতি যথাযথ নজর রাখেন না! তারা জানেন না এগুলো হচ্ছে সালাত ও সিয়ামের মত-ই ফরজ দায়িত্ব?

চার

সম্মানিত পাঠক! উপরে অনেকগুলো কেন নিয়ে আপনি চিন্তা করেছেন! ভেবেছেন এমন কেন হয়? আমিও ভেবেছিলাম এমন কেন হয়? সমাধান বের করার চেষ্টা করেছি, অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, ফোরামে অনেক বিজ্ঞজন আছেন, ভুল হলে তারা শুধরে দিবেন ইনশা আল্লাহ!

পাঠক আমি শুধু জিহাদি ফ্রন্টগুলোর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি, আপনাদের সেদিকে রাখার চেষ্টা করেছি, কারণ সাধারণ পরিবেশগুলো আজকে যে এতো ফিতনাময়, তাতো হওয়ার- ই কথা, কিন্তু কেন জিহাদের ফ্রন্টগুলোতে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে, নিশ্চই তা একজন দরদে দিলের ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ হবে। মুজাহিদিনের মাঝে সমস্যাগুলো দেখা দেয় কোন স্বার্থের কারণে অথবা কোন স্বার্থের কারণ ছাড়া-ই, যেটাই হোক এর মুলে রয়েছে মুজাহিদিনের ইলম অর্জনের কমতি, তাওহিদ ও জিহাদ শিখার ক্ষেত্রে কমতি, ইলম অর্জনকে ধারাবাহিকভাবে জারি না রাখার কমতি। অনেকের ক্ষেত্রে তাকওয়া না থাকার সমস্যা বলতে পারেন, ফলে সে আমীরের অবাধ্য হয়েছে, ফিতনা সৃষ্টি করেছে, এক্ষেত্রেও আমি বলবো ইলমের কমতি, কারণ ইলম তো ওই জ্ঞানকে বলা হবে, যা বান্দার মাঝে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে, তাকওয়া সৃষ্টি করে। মালুমাত অর্জনের পাশাপাশি সমানভাবে ইলম অর্জন করা উচিত। এই পর্যায়ে এসে আমি পাঠকদের বলবো ইলম কাকে বলে, ইলমের প্রকারভেদ ও গুরুত্ব নিয়ে প্রদান করা শহীদ উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহঃ এর ৩ পর্বের দরসটি শুনে নিবেন!

সম্মানিত পাঠক পুরো আলোচনায় আমি এটাই বুঝাতে চেয়েছি যে, ইলম অর্জন ও তা প্রয়োগ করার কমতির কারণেই জিহাদি ময়দানগুলোতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, আমরা ফিতনায় জড়িয়ে যাচ্ছি, তাই এখন থেকেই ইলম অর্জন করার দিকে মনোনিবেশ করুন! ইন্টারনেটে বাংলা, আরবি, উর্দু ও ইংরেজিতে প্রচুর উপাদান রয়েছে, তা কাজে লাগান! ইনশা আল্লাহ সামনের কোন আলোচনায় আমরা জিহাদি রিলিজগুলো থেকে কিভাবে ইলম অর্জন করতে পাড়ি, সে ব্যাপারে অধমের কিছু ধারণা/পরিকল্পনা শেয়ার করবো।

পরিশেষে এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতকারে বলা একটি গল্প বলে শেষ করছি- "এক ভাই ইলম অর্জন শেষ না করেই জিহাদের ময়দানে নেমে যাওয়ার আব্দার করেছেন, মাসুল তাকে বললেন, ভাই! যে ভাইয়ের যত বেশি ইলম থাকবে, সে তত বেশি জিহাদের খেদমত করতে পারবে!" সুতরাং পাঠক আমিও বলবো-সম্ভাব্য সকল পন্থায় ইলম অর্জন করুন! সময়গুলোকে কাজে লাগান! কারণ যার যত বেশি ইলম আছে, সে ততবেশি উত্তমভাবে জিহাদের ফরজ দায়িত্ব আদায় করতে পারবে।

ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮০৫৯

সারগর্ভ: একটি কৌশলগত পর্যালোচনা-

আবু আনওয়ার আল-হিন্দি (হাফিযাহুল্লাহ)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-২৪-২০১৭

আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ'র **"দ্বীন কায়েম: একটি কৌশলগত পর্যালোচনা"** বেশ কিছু দিন আগে ফোরামে ধারাবাহি পোস্ট হয়েছে। **'আল হিকমাহ মিডিয়া' চার পর্বে** সেটির পিডিএফ পরিবেশন করেছে। বৈশ্বিক জিহাদের কৌশল ও মানহাজ সম্পর্কে এটি একটি অতুলনীয় লেখা; বিশেষত বাংলা ভাষায়।

ইচ্ছে হল লেখাটার একটা খোলাসা ও সারমর্ম লিখে দিই। আবু আনওয়ার আল-হিন্দি (হাফিযাহুল্লাহ) যা লিখেছেন, সেটাও মূলত খোলাসা আকারেই লিখেছেন। তথাপিও ইচ্ছে হল একটা খোলাসা লিখে দিই, যাতে মূল লেখাটা পড়ার পূর্বে যদি কেউ এ খোলাসাটা পড়ে, তাহলে যেন পুরো লেখাটার একটা সারমর্ম তার সামনে এসে যায়। তাছাড়া আমার লেখাটার উপলক্ষ্যে হিন্দি হাফিজাহুল্লাহ'র লেখাটার আবার তাযকিরাহ্ হবে। অনেকে হয়তো সেটা পড়বে। এতে করে লেখাটার প্রচার-প্রসার বাড়বে। তাই খোলাসটা লিখতে ইচ্ছে হল।

মূল লেখা: ৬০ পৃষ্ঠা, **খোলাসা:** ২০ পৃষ্ঠা।

উল্লেখ্য, আলোচনার শেষ পর্বে [কৌশলগত পর্যালোচনা: বাংলাদেশ] শীর্ষক অংশটাকে খুব বেশি সংক্ষিপ্ত না করে, হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ যেমন লিখেছেন, তেমনি রাখার চেষ্টা করেছি। কারণ, আমাদের জন্য এ আলোচনাটা অনেক জরুরী। ডক ডাউনলোড:

https://my.pcloud.com/publink/show?c...NIHo8L6LNAVEcX
https://mega.nz/#!wjhyCbgJ!9Fje81j_pA_QBVHF1N168mZxO
vyJNHEdrOzpJQC Qols

পিডিএফ:
https://archive.org/download/sargorb...orjalocona.pdf

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮২৩২